উৎসর্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ও

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর

করকমলে—

—অশোক

নিবেদন

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলির বিশ্লেষণ করা হইল। সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে বহু তথ্য এবং য়ুরোপীয় সাঙ্কেতিক সাহিত্য সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল। আশা করা যায় যে রসপিপাসুচিত্ত এই সমালোচনা-পুস্তক পড়িয়া আনন্দিত হইবেন।

অশোক সেন





সূচীপত্র



সাঙ্কেতিকতা

সমস্ত দৃশ্য জগৎই সঙ্কেতময়। যাহা দৃশ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই অদৃশ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে। সীমার রম্য-বীণার তারে অসীম নিরন্তর সুর-ঝঙ্কার তুলিতেছে। তাহাতে যে মধুর ও স্বর্গীয় সুর-তান-লয়-সমন্বিত অপার্থিব ও অপরূপ আনন্দলহরীর সৃষ্টি হইতেছে তাহা উপলব্ধি ও উপভোগ করিবার মত শক্তি, সাধনা ও অধিকার যাঁহাদের আছে তাঁহারাই প্রকৃত সার্থকজন্মা পুরুস। রূপক বা প্রতীকের একটা বাহ্যিক রূপ আছে। কিন্তু ইহাই তাহার চরম পরিচয় নহে। বাহ্যিক রূপটা আমাদের তৃপ্ত হইতে দেয় না। ইঙ্গিতের দ্বারা আমাদের উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা করে অন্তর্নিহিত একটা গভীরতর বিরাটত্বের স্বরূপ—যাহার পরিচয় আভাসের বা ইসারার মধ্য দিয়াই আসে এবং ক্ষণে ক্ষণে মিলাইয়া যায়।

সাঙ্কেতিকতা মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। শব্দ, বাক্য, হাসি, কান্না প্রভৃতি সকলই মানুষের ভাব প্রকাশের নানারূপ সঙ্কেত বা চিহ্ন। এ ধরণের সঙ্কেতের বিশেষত্ব এই যে ভাবের দিকটা বাদ দিলে ইহাদের নিজস্ব কোন পরিচয় থাকে না। বর্ণ বা শব্দের মূলেই রহিয়াছে সাঙ্কেতিকতা। সেই হিসাবে সাঙ্কেতিকতাকে বাদ দিয়া সাহিত্য এমন কি ভাষারও কোন তাৎপর্য্য থাকে না। বর্ণ বা শব্দ যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন কতকগুলি চিহ্ন হিসাবেই তো এগুলির জন্ম—ব্যবহৃত হইতে হইতে ক্রমে চিহ্নগুলির চিহ্নত্বের পরিচয় আমরা বিস্মৃত হই এবং তাৎপর্য্যের দিকটাই প্রধান হইয়া

দাঁড়ায়। প্রথম যেইদিন মানুষ শব্দ বা বাক্য দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি করিতে শিখিল সেইদিন হইতেই সাঙ্কেতিকতার আরম্ভ বা জন্মদিবস।

সাঙ্কেতিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মত। প্রথম যখন কোন সঙ্কেত সৃষ্ট হয় তখন যে ভাবের বাহনরূপে উহা ব্যবহৃত হয়, তাহার অনেকখানিই উহা দ্বারা বোঝা বা বোঝানো যায় না। [সাঙ্কেতিকতা যখন একটা পরিণত রূপ নেয় তখন যে শিল্পী সঙ্কেত সৃষ্টি করেন তাঁহার চেতন মনের ভাবরাশি ছাড়াও তাঁহার অবচেতন অথবা অধিচেতন মনের ভাবগুলিও ঐ সঙ্কেতের মধ্যে পরিচালিত হয়। ইহার উপর শিল্পীর অজ্ঞাতসারে আরও অনেক গভীর এবং মহৎ চিন্তা ও অতীন্দ্রিয় ভাবধারাও ঐ সকল সঙ্কেত হইতে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। সৃষ্ট সঙ্কেত—অবশ্য পরিণত অবস্থায়—অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং স্বপ্রধান হইয়া উঠে। যে আলোক দিবার জন্য সে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা ছাড়াও নব নব আলোক, নব নব রূপ, নব নব ভাব এবং নানা বর্ণ গন্ধ সৌন্দর্যসম্ভারের সৃষ্টি করিয়া রসিকদিগের চিত্ত আনন্দে ভরিয়া দেয়।] কারণ সাঙ্কেতিকতা যে মূলতঃই arbitrary creation. পরে ব্যবহারের অভ্যাসে সঙ্কেতগুলি আর সঙ্কেত থাকে না। ভাবের বাহন হইতে একেবারে ভাবের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমে ক্রমে ভাব এবং অঙ্গও এতটা যুক্ত হইয়া পড়ে যে এক ব্যতিরেকে অপরকে আর পৃথক্ ভাবে দেখা যায় না। এ তো গেল সহজ কথায় সহজ ভাবে সাঙ্কেতিকতার কথা। সাহিত্যের সাঙ্কেতিকতা যে আবার এক বিরাট জটিল রূপ নিয়াছে সেই কথাই এবার আলোচনা করিব।

সাঙ্কেতিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যে ভাবকে বা সত্যকে ইহা রূপ দিতে চায় তাহাকে প্রথমে অমূর্ত করিয়া রাখে অর্থাৎ লুকাইয়া রাখিয়া দেয়। কিন্তু এই অমূর্ত করিয়া রাখিবার

মধ্যে একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। যে সকল সহজ সত্য বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে সাধারণ ভাবে বলিলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ বা মর্ম্মস্পর্শ করে না তাহাদের যখন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় তখন ঐ অমূর্ত রূপই তাহাদের অধিকতর স্পষ্ট করিয়া এবং অধিকতর মূর্ত করিয়া তোলে। যে আলোক সকল জ্যোতির জ্যোতি তাহা তো অন্ধকারের স্তরে স্তরেই গুপ্তভাবে অবস্থান করে। বাহিরে কালো আবরণ দেখিয়া যে হতচকিত হইবে সে তো ঐ অমূর্ত আলোকের স্বরূপ কোনকালেই বুঝিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু যাহার দেখিবার চোখ আছে সেই বুঝিবে অমূর্ততাই ঐ অদৃশ্য আলোককে দ্বিগুণতর উজ্জ্বল, পরিস্ফুট এবং মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। তবে এই অমূর্ত করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা কেন? ইহার কারণ এই, যাহাকে প্রকাশ করিবার বা রূপ দিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাকে সাধারণ উপায়ে এবং পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়া তোলা মানুষের সাধ্যের অতীত। এইজন্যই বলা এবং না-বলা, পরিচয় এবং অপরিচয়ের মধ্য দিয়াই উহার স্বরূপ বোঝাইবার চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়।

সাঙ্কেতিকতা যখন একটা পরিণত রূপ বা আকার ধারণ করে, তখন তাহার ভিতর সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিবার একটি ব্যাকুলতা উপলব্ধি করা যায়। সত্যকার প্রতীকের মধ্যে সীমা ও অসীমের সঙ্গম অনুভব করা যায়। সুতরাং প্রতীক অবলম্বন করিয়া অসীমকে, অতীন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করিবার মত এমন সহজ উপায় আর নাই। কি সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান বা স্থাপত্য, অর্থাৎ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চিরকাল ধরিয়া প্রতীকের ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। তবে এবিষয়ে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের তফাৎ এই যে অতীতের তুলনায় বর্ত্তমানে অনেক বেশী consciously প্রতীকগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মানুষের জীবনধারা এবং সভ্যতার ইতিহাসের বিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে মানুষের sense of values ক্রমাগত বদলাইতেছে। মানুষের চিন্তাধারা, সময় এবং ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাল রাখিয়া রূপ হইতে রূপান্তরের ভিতর দিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের অঙ্গাঙ্গিভাব—সুতরাং সাহিত্যেরও রূপ বহুরূপী জীবনধারাকে প্রতিভাত করিতে গিয়া একভাবে না থাকিয়া নানা রূপ ধারণ করিতেছে। কি আঙ্গিকের দিক দিয়া, কি বিষয় বস্তুর ব্যাপারে, একটা গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে বর্ত্তমান সাহিত্যের মধ্যে। অতীতের বাস্তববাদী মানুষ যে জড়-সাহিত্য লইয়া একদিন পরিতুষ্ট এবং তৃপ্ত থাকিত, বর্ত্তমান মানবমন তাহা দ্বারা আকৃষ্ট বা পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। বহুকাল জড়বাদীরূপে বাস্তবতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া মানুষ আজ হাঁফাইয়া উঠিয়াছে কিন্তু আত্মাকে তো আর চিরকাল এভাবে উপবাসী রাখা যায় না। এই কারণেই মানুষ নিজের গভীরতম সত্তাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য নূতন ধরণের সাহিত্য আবিষ্কারের দিকে মনোনিবেশ করিল। এই নূতন সাহিত্যই সাঙ্কেতিক-সাহিত্য। অবশ্য সাহিত্য সৃষ্টির সুরু হইতেই কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির ভিতর যে সাঙ্কেতিকতার নিদর্শন অল্পস্বল্প ছিল না এমন নয়—কারণ সাঙ্কেতিকতা যে আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। সুতরাং জীবনকে রূপ দিতে গিয়া জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ সাঙ্কেতিকতাকে বাদ দিলে, সে রূপ যে অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট হইবে, একথা তো সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ঠিক পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক-সাহিত্য বর্ত্তমান যুগেই সৃষ্ট হইয়াছে একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না। অতিরিক্ত বাস্তববাদের অবসাদের ক্লান্তির পর মানুষ নূতন পথের সন্ধান পাইয়া বুঝিতে শিখিল যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতটাই তাহার পক্ষে চরম সত্য নয়, ইহাকে

অতিক্রম করিয়া আরো একটা বড় জগৎ আছে, যাহাকে এযাবৎ সে কল্পনা প্রসূত মনে করিয়াই অবজ্ঞায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। যাহাকে অবাস্তব মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল, এতকাল পরে সাঙ্কেতিকতার মধ্য দিয়া তাহার প্রকৃত রূপ অর্থাৎ অতিবাস্তবতা আবিষ্কার করিল। কলাশিল্প সাঙ্কেতিকতার ভিতর দিয়া যে সৌন্দর্য্যকে লাভ করিল তাহাই আবার শিল্পকে চরমতম এবং পরমতম অনাদি অনন্ত অসীম চিরসুন্দরের দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল।

একথা অনস্বীকার্য্য যে সাঙ্কেতিক সাহিত্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার আঙ্গিকের দিকটা। এই আঙ্গিকের উপর বিশেষ নজর না দিলে সাঙ্কেতিকতার মূল উদ্দেশ্যগুলিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। শিল্পীর শিল্প কৌশলের চরম সার্থকতা নির্ভর করিবে এই আঙ্গিকের দিকটাকে একটা পরম পরিণতিতে লইয়া যাইবার মধ্যে। ইহার অর্থ এই নহে যে বাহ্যিক অঙ্গটাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অঙ্গের মধ্যকার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে লাভ করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য তখনই সফল হইবে যখন শিল্পী আঙ্গিককে একটা পরম পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন। পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়াই অঙ্গ নিজেকে বিলুপ্ত করিবে এবং নিহিত ভাবটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবে। Arthur Symons বলেন—

There is such a thing as perfecting form that form may be annihilated.

প্রতীক সাহিত্যের মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে "কার্লাইল" 'ফ্রয়েড্' এবং 'আর্থার সাইমন্‌সের' মতবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Speech is too often not, as the Frenchman defined it, the art of concealing Thought; but of quite stifling

and suspending Thought, so that there is none to *conceal*. Speech too is great, but not the greatest. As the Swiss inscription says : *Sprechen ist silbern, Schweigen ist golden* (Speech is *silvern*, silence is golden) ; or as I might rather express it : Speech is of Time, Silence is of Eternity.

.. ..

.. ..

Of kin to the so incalculable influences of concealment, and connected with still greater things, is the wondrous agency of Symbols. In a symbol there is concealment and yet revelation : here therefore, by Silence and by Speech acting together, comes a double significance. And if both the Speech be itself high, and the silence fit and noble, how expressive will their union be ! Thus in many a painted Device, or simple seal-emblem, the commonest truth stands out to us proclaimed with quite new emphasis.

For it is here that Fantasy with her mystic wonderland plays into the small prose domain of sense, and becomes incorporated therewith. In the Symbol proper, what we can call a Symbol, there is ever, more or less distinctly and directly, some embodiment and revelation of the Infinite ; the Infinite is made to blend itself with the Finite, to stand visible and as it were, attainable there.

By Symbols, accordingly, is man guided and commanded, made happy, made wretched. He everywhere finds himself encompassed with Symbols, recognised as such or not recognised : the universe is but one vast Symbol of God ; nay if thou wilt have it, what is man himself but a Symbol of God ; is not all that he does Symbolical ; a revelation to sense of the mystic God-given force that is in him ; a "Gospel of Freedom" which he, the "Messiah of Nature" preaches, as he can, by act and word ? Not a Hut he builds but is the visible record of invisible things, but is, in the transcendental sense, Symbolical as well as real.

.. ..
.. ..

It is in and through Symbols that man, consciously or unconsciously, lives, works, and has his being : those ages, moreover, are accounted the noblest which can the best recognise symbolical worth, and prize it the highest. For, is not a symbol ever, to him, who has eyes for it, some dimmer or clearer revelation of the God-like ?

.. ..
.. ..

Highest of all symbols are those wherein the Artist or Poet has risen into Prophet, and all men can recognise a present God, and worship the same : I mean religious symbols.

(Sartor Resartus—Book III, Chap. III.)—Carlyle.

......"The process of thinking in symbols is natural and inherent in the mental procedure. Man has a symbol-making mind. We both feel and see resemblances and in words hear them and play and pun upon them. They please and attract. They fall in with the more primary order of mental movement. Thinking is imaging; the pictorial antedates the verbal; the imagination realizes and idealizes. When we drift in thought and muse, we are near to the mood of symbolism.

The art of communication makes primitive man a sign-maker; his urge to explain makes him a myth-maker, and a believer in signs; in all he is, symbolic. Were it not that he can make one thing stand for another, he could hardly think. Myth and fable derive their appeal from the same source. They set the fancy free and bring the remote together. Myths have been well termed the dreams of the race."

(Freud—His Dreams and Sex Theories
—by Joseph Jastrow, Ph.D., LL.D.)

Without symbolism there can be no literature; indeed, not even language. What are words themselves but symbols, almost as arbitrary as the letters which compose them, mere sounds of the voice to which we have agreed to give certain significations, as we have agreed to translate these sounds by those combinations of letters?

Symbolism began with the first words, uttered by the first man, as he named every living thing, or before them, in heaven, when God named the world into being and we see, in these beginnings, precisely what symbolism in literature really is : a form of expression, at the best but approximate, essentially but arbitrary, until it has obtained the force of a convention, for an unseen reality apprehended by the consciousness. It is sometimes permitted to us to hope that our convention is indeed the reflection rather than merely the sign of that unseen reality. We have done much if we have formed a recognisable sign.

"A Symbol", says Comte Goblet d'Alviella, "might be defined as a representation which does not aim at being a reproduction." Symbol = every conventional representation of idea by form, of the unseen by the visible. What distinguishes the symbolism of our day from the symbolism of the past, is that it has now become conscious of itself, in a sense in which it was unconscious .....The forces which mould the thought of men change, or men's resistance to them slackens ; with the change of men's thought comes a change of literature, alike in its inmost essence and in its outward form. After the world has starved its soul long enough in the contemplation and rearrangement of material things, comes the turn

of the soul and with it comes the literature of which I write in this volume, a literature in which the visible world is no longer a reality, and the unseen world no longer a dream.

Symbolism— in which art returns to the one pathway, leading through beautiful things to the eternal beauty. In most of the writers.........summing up in themselves all that is best in symbolism, it will be noticed that the form is very carefully elaborated. There is such a thing as perfecting form that form may be annihilated. It is all an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of exteriority. Description is banished that beautiful things may be evoked magically; the regular beat of verse is broken in order that words may fly upon subtler wings. Mystery is no longer feared, as the great mystery in whose midst we are islanded, was feared by those to whom that unknown sea was only a great void. We are coming closer to nature, as we seem to shrink from it with something of horror, disdaining to catalogue the trees of the forest. And as we brush aside the accidents of daily life, in which men and women imagine that they are alone touching reality, we come closer to humanity that may have begun before the world, and may outlast it.

Here, then, in this revolt against exteriority, against rhetoric, against a materialistic tradition; in this

endeavour to disengage the ultimate essence, the soul, of whatever exists and can be realised by the consciousness; in this dutiful waiting upon every symbol by which the soul of things can be made visible; literature bowed down by so many burdens, may at last attain iiberty, and its authentic speech. In attaining this liberty, it accepts a heavier burden; for in speaking to us so intimately, so solemnly, as only religion had hitherto spoken to us, it becomes itself a kind of religion, with all the duties and responsibilities of the sacred ritual.

(The Symbolist Movement in Literature
—Arthur Symons).

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। যে সকল সাহিত্য শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহাদের সকলের মধ্যেই নানাধরণের ইঙ্গিত, ইসারা, আভাস এবং ব্যঞ্জনার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। আপাতদৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব, তথ্য, সত্য বা সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা মোহিত বা চমৎকৃত হই, তাহা ছাড়াও আরো গভীরতর, নিবিড়তর, চরম এবং পরম সত্যগুলি ভিতরে অন্তর্নিহিত-ভাবে লুক্কায়িত থাকে। ক্রমাগত নিবিষ্টভাবে পড়িতে পড়িতে দৃষ্টির আবরণগুলি অপসারিত হইতে থাকে এবং ক্রমাগত নব নব আলোক দেখিয়া আমরা বিস্মিত, চকিত এবং মুগ্ধ হইয়া যাই। কার্লাইল শেক্স্পিয়র সম্বন্ধে এই কথাটাই বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

"The latest generations of men will find new meanings in Shakespeare, new elucidations of their own human being; new harmonies with the infinite structure of the

Universe ; concurrences with later ideas, affinities with the higher powers and senses of man."

শেলী বলেন—All high poetry is infinite......veil after veil may be undrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never expressed. A great poem is a fountain for ever, overflowing with the waters of wisdom and delight ; and after one person and age has exhausted all its divine influence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and unconceived delight.

[A defence of poetry.

সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে বহুকাল হইতেই আমাদের দেশে সাহিত্যের suggested sense বা spirit সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়া আসিয়াছে। কাব্য-বিচারে ধ্বনিবাদের স্থাপনা হয় বহুদিন পূর্ব্বে এক অজ্ঞাত লেখকের দ্বারা। ধ্বনিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন (নবম শতাব্দী) ও আচার্য্য অভিনবগুপ্ত (দশম-একাদশ শতাব্দী)। ধ্বনি বলিতে এমন কিছুকে বুঝায় যাহা শব্দ-সমষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বুঝায় না, বুঝায় আভাস, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা, অনুরণন প্রভৃতির দ্বারা। বাচ্যার্থ আছে অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া আরও একটি গভীর অর্থ দেখা দিয়াছে—এই গভীর অর্থটিই ধ্বনি।

ধ্বনিবাদ বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের অলঙ্কার সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে একথা অনস্বীকার্য্য। তবে বর্ত্তমান যুগে Symbolical Literature বা সাঙ্কেতিক-সাহিত্য বলিতে আমরা

যে জটিল ধরণের সাহিত্যকে বুঝি ততটা পরিণত রূপ সংস্কৃত বা রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা-সাহিত্যে ছিল না একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। অবশ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সকল শিল্পকলাই সাঙ্কেতিকতাপূর্ণ। প্রত্যেক শিল্পীই তাঁহার শিল্পের ভিতর কিছু না কিছু সঙ্কেতের ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ সাহিত্যিকের সাহিত্যে সঙ্কেত ব্যবহৃত হয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আর সাঙ্কেতিক-সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে সমস্তটাই প্রতীকময় এবং সঙ্কেতমণ্ডিত। তিনি সঙ্কেতের ব্যবহার করেন একটা বিরাট এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তরূপে। সঙ্কেতকে বাদ দিলে তাঁহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়—তাঁহার সাহিত্য রূপ নিতে পারে না। এইজন্যই তাঁহাকে একটি বিশেষ রীতি অর্থাৎ সাঙ্কেতিক-শিল্পকৌশল অবলম্বন করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে W. B. Yeats-এর 'Ideas of Good and Evil' পুস্তক হইতে কিছুটা তুলিয়া দেওয়া গেল—

"All art that is not mere story-telling, or mere portraiture, is symbolic, and has the purpose of those talismans which mediaeval magicians made with complex colours and forms, and bade their patients ponder over daily, and guard with holy secrecy, for it entangles, in complex colours and forms, a part of the Divine Essence. A person or a landscape that is a part of a story or a portrait, evokes but so much emotion as the story or the portrait, can permit without loosening the bonds that make it a story or portrait ; but if you liberate a person or a landscape from the bonds of motives and their actions, causes and their effects, and from all bonds but

the bonds of your love, it will change under your eyes, and become a symbol of an infinite emotion, a perfected emotion, a part of the Divine Essence ; for we love nothing but the perfect, and over dreams make all things perfect, that we may love them. Religious and visionary people, monks and nuns, and medicinemen and opium-eaters, see symbols in their trances ; for religious and visionary thought is thought about perfection and the way to perfection ; and the symbols are the only things free enough from all bonds to speak of perfection.

Wagner's dramas, Keats' odes, Blake's pictures and poems, Calvert's pictures, Rossetti's pictures, Villiers De L'Isle Adam's plays, and the black-and-white art of Mr. Beardsley and Mr. Ricketts, and the lithographs of Mr. Shannon, and the pictures of Mr. Whistler, and the plays of M. Maeterlinck, and the poetry of Verlaine, in our own day, but differ from the religious art of Giotto and his disciples in having accepted all symbolisms, the symbolism of the ancient shepherds and star-gazers, the symbolism of bodily beauty which seemed a wicked thing to Fra Angelico, the symbolism in day and night, and winter and summer, spring and autumn, once so great a part of an older religion than Christianity ; and in having accepted all the Divine Intellect, its anger and its pity, its waking and its sleep, its love and its lust,

for the substance of their art. A Keats or a Calvert is as much a symbolist as a Blake or a Wagner ; but he is a fragmentary symbolist, for while he evokes in his persons and his landscapes an infinite emotion, a perfected emotion, a part of the Divine Essence, he does not set his symbols in the great procession as Blake would have him, 'in a certain order suited' to his 'imaginative energy.'

শিল্পীর অনুভূতির তীব্রতা, দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা, স্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ-বর্ণনাশক্তির অনেকটাই নির্ভর করে তাঁহার imagery ব্যবহারের কৌশলের উপর। Metaphor এর ভিতর দিয়াই সব চেয়ে সুষ্ঠুভাবে ভাবকে আকৃতি দেওয়া যায় এবং শিল্পীর অনুভূতিগুলি অন্য হৃদয়ে প্রকৃষ্টভাবে সঞ্চালিত করা হয়। Babette Deutsch তাঁহার 'This Modern Poetry' বইতে লিখিয়াছেন—

......And yet so notable an exponent of symbolism as de Gourmont saw in his imagism a natural development of the symbolist movement. It was, if you please, a kind of invested symbolism. Instead of suggesting to the mind of the reader, by a cumulation of tremulous images, merging into one another, the poet's emotion, which always carried as an overtone a sense of mystery, the imagist roused a sufficient feeling of wonder by presenting the naked impact of the object upon the senses in a concentrated metaphor. Both welcomed the evidence of the developing science of psychology, that

the image, the symbol, floating up from the depths of the mind, was the most faithful ambassador of the psyche.

মানুষ ভাবপ্রবণ—মানুষ স্রষ্টা ও শিল্পী। অনাদি, অনন্ত, অসীম, অতনু ঐশ্বরিক শক্তির বিবিধ অরূপ-রূপের বিবিধ প্রতিচ্ছবি নানাভাবে এবং নানারূপে প্রতিনিয়ত মানুষের শিল্পীমনের উপর প্রতিফলিত হইতেছে। এই প্রতিচ্ছবিগুলিকেই সে চায় মন হইতে মনে, হৃদয় হইতে হৃদয়ে, প্রাণ হইতে প্রাণে, চালনা করিতে, ব্যাপ্ত করিতে, উৎক্ষিপ্ত করিতে। এই কার্য্যে তাহার প্রধান সহায় এবং বাহন সাঙ্কেতিকতা বা বিভিন্ন ধরণের প্রতীকগুলি। ইংরাজ imagist বা symbolist কবি William Blake বলেন—

......The world of imagination is the world of Eternity. It is the Divine bosom into which we shall all go after the death of the vegetated body. The world of imagination is infinite and eternal, whereas the world of generation or vegetation is finite and temporal. There exist in that eternal world the eternal realities of everything which we see reflected in the vegetable glass of nature.

সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে W. B. Yeats তাঁহার 'Ideas of Good and Evil' বইতে বলিয়াছেন—

There are no lines with more melancholy beauty than these by Burns—

"The white moon is setting behind the white wave,
And time is setting with me, O !"

and these lines are perfectly symbolical. Take from

them the whiteness of the moon and of the wave, whose relation to the setting of Time is too subtle for the intellect, and you take from them their beauty. But, when all are together, moon and wave and whiteness and setting Time and the last melancholy cry, they evoke an emotion which cannot be evoked by any other arrangement of colours and sounds and forms. We may call this metaphorical writing, but it is better to call it symbolical writing, because metaphors are not profound enough to be moving, when they are not symbols, and when they are symbols they are the most perfect, because the most subtle, outside of pure sound, and through them one can the best find out what symbols are.

.. ..

.. ..

All sounds, all colours, all forms, either because of their pre-ordained energies or because of long association, evoke indefinable and yet precise emotions, or, as I prefer to think, call down among us certain disembodied powers, whose footsteps over our hearts we call emotions ; and when sound, and colour, and form are in a musical relation, a beautiful relation to one another, they become as it were one sound, one colour, one form and evoke an emotion that is made out of their distinct evocations and yet is one emotion. The same relation exists between all portions of every work of art, whether it be an epic

or a song, and the more perfect it is, and the more various and numerous the elements that have flowed into its perfection, the more powerful will be the emotion, the power, the god it calls among us. Because an emotion does not exist, or does not become perceptible and active among us, till it has found its expression, in colour or in sound or in form, or in all of these, and because no two modulations or arrangements of these evoke the same emotion, poets and painters and musicians, and in a less degree because their effects are momentary, day and night and cloud and shadow, are continually making and un-making mankind.

জীবন ছন্দোময়—বস্তুজগতে, ভাবরাজ্যে, প্রকৃতির সর্ব্বত্র আমরা ছন্দের নৃত্য (rhythmic dance) দেখিতে পাই। ইহাকে কবির উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। এমন কি জড় বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে প্রত্যেক বস্তুকেই শেষ পর্য্যন্ত electron এবং proton বা positive and negative charges of electricity তে ভাগ করা যায়। ইহারাও আবার স্থাণু নয়,—ইহারাও নৃত্যময় ও ছন্দোপূর্ণ। সাহিত্যিক বা শিল্পীর কাজ হইল এই ছন্দকে (rhythm) তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করা। ছন্দের দ্বারাই স্রষ্টা তাঁহার নিগূঢ় চিন্তা এবং অনুভূতিগুলিকে একটা রূপ এবং আকার দিতে সমর্থ হন। কত ভাব, কত সত্য, কত উপলব্ধিভূত সৌন্দর্য্য শিল্পীর মনে ক্ষণে ক্ষণে উদয় হইয়া আবার মিলাইয়া যায়। এগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী না করিতে পারিলে, অর্থাৎ খানিকটা স্থায়িত্ব না দিতে পারিলে সৃষ্টির সার্থকতা

আসে না—এই খানেই ছন্দের আবশ্যকতা। কবি বা শিল্পী বা সৌন্দর্য্যস্রষ্টা যখন ছন্দের বন্ধনের মধ্য দিয়া অনুভূতিলব্ধ ভাবরাশিকে রূপ দিতে ব্যাপৃত থাকেন, অর্থাৎ, স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করিবার মাহেন্দ্রক্ষণে উপনীত হন, সে সময়ে তাঁহার মানসিক অবস্থা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির ভিতর অবস্থান করে। এই সৃষ্টির পরমক্ষণে তিনি একই সঙ্গে নিদ্রিত এবং জাগ্রত, চেতন এবং অচেতন, সুপ্ত এবং সচকিত। ছন্দের বাহ্যিক সমস্বরতাই এই নিদ্রা, অচেতনতা বা সুপ্তির দিকে শিল্পীকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। আবার ছন্দের অন্তরে নিহিতভাবে যে অনুরণন এবং বৈচিত্র্য আছে, তাহাই তাঁহাকে জাগরিত, সচেতন এবং সচকিত করিয়া রাখে। এই না-জাগ্রত এবং না-নিদ্রিত অবস্থার মধ্য দিয়াই শিল্পী-মন একটা অবচেতনতার স্তরে গিয়া উপনীত হয়। একথা সহজেই অনুমেয় যে এই অবস্থায় স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়—ইচ্ছাশক্তির পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া শিল্পী-মন নিজেকে ব্যাপ্ত, বিকশিত, প্রকাশিত এবং রূপায়িত করে নানারূপ প্রতীক-সৃষ্টির ভিতর দিয়া। এই প্রসঙ্গে Yeats-এর Ideas of Good and Evil পুস্তক হইতে আরো কিছুটা তুলিয়া দেওয়া গেল—

The purpose of rhythm, it has always seemed to me, is to prolong the moment of contemplation, the moment when we are both asleep and awake, which is the one moment of creation, by hushing us with an alluring monotony, while it holds us waking by variety, to keep us in that state of perhaps real trance, in which the mind liberated from the pressure of the will is unfolded in symbols.

...   .

...   .

So I think that in the making and in the understanding of a work of art, and the more easily if it is full of patterns and symbols and music, we are lured to the threshold of sleep, and it may be far beyond it, without knowing that we have ever set our feet upon the steps of horn or of ivory.

আরো বিশদভাবে সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সাঙ্কেতিকতা (symbolism) এবং রূপকের (allegory) পার্থক্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। রূপক বলিতে আমরা নীতিগর্ভ আখ্যানগুলির কথাই মনে করি—যেমন শকুন্তলা, Divine Comedy, Faery Queene, Faust, Pilgrim's Progess ইত্যাদি। রূপকে দুইটি অর্থ থাকে—উপাখ্যানের এবং উপাখ্যান-অতীত ভাবের। নীতি-কথার নীতির দিকটা পরিষ্কার, প্রত্যক্ষ এবং সাধারণভাবে বলিলে অনেক সময়েই নীরস প্রতীয়মান হয়। এই বিপদ এড়াইবার জন্যই রূপক-কার নীতিকথাকে সরস আখ্যানের আবরণের দ্বারা আবৃত করিয়া দেন। ফলে শুষ্ক নীতি হইয়া দাঁড়ায় রসে ভরপুর প্রাণবন্ত এবং বিস্ময় উদ্রেককারী সজীব-সাহিত্য। সাঙ্কেতিক রচনায় নীতির প্রচার করা হয় না। সাঙ্কেতিক শিল্পী চেষ্টা করেন যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, যাহা অশরীরী, অনাদি, অনন্ত, অপার্থিব, সেই অমূর্ত্ত সত্তা সম্বন্ধে আমাদের সচকিত করিতে ও অবহিত হইতে। যাহার বাণী নাই কবি তাহাকে ভাষার দ্বারা মূর্ত্ত করিবার প্রচেষ্টা করেন। যাহা দৃষ্টির অতীত, কবি সেই অরূপকে রূপ দিবার চেষ্টা করেন। Blake এর কবিতা, Yeats এর নাটক, Ibsen, Strindberg এর কয়েকটি

নাটক, Gerhart Hauptmann এর Hannele, The Sunken Bell, Henry of Aue প্রভৃতি নাটক, French Symbolist School of Poetry, Maeterlinck এর নানা নাটক, রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা এবং রাজা, ডাকঘর প্রভৃতি নাটক এই শ্রেণীতে পড়ে।

প্রতীক বা সঙ্কেতের ভিতর হইতে আমরা দুইটি অর্থ পাই। একটি সাধারণ অর্থ, যাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়, আর একটি গুপ্ত-অর্থ, যাহা অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের মানসপটে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। সংস্কৃত-ধ্বনিকারগণ কাব্যার্থের এই দুই দিকের নাম দিয়াছেন বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মান অর্থ। অভিধা শক্তি দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহারই নাম মুখ্যার্থ। আর ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা যে প্রতীয়মান অর্থকে লাভ করা যায় তাহার নাম ব্যঙ্গার্থ। সংস্কৃতে ধ্বনিকার বলেন—সুন্দরী নারীদিগের রূপমাধুরী এবং দেহলাবণ্য যেমন তাঁহাদের অঙ্গ বা দেহের অতিরিক্ত অন্য কিছু—যদিও দেহ এবং অবয়বের দ্বারাই উহা সৃষ্ট এবং প্রকাশিত—কাব্যের প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গার্থও সেইরূপ কাব্যের অবয়বরূপ, শব্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা রচিত ব্যাচ্যার্থের অতিরিক্ত অন্য এক বস্তু—যদিও বাচ্যার্থের দ্বারাই তাহা সৃষ্ট এবং প্রকাশিত।

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীণাম্
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

(ধ্বন্যালোক)

সঙ্কেত সাহিত্যে প্রথমতঃ এই দুইটি অর্থই থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যঙ্গার্থটি এমন হওয়া চাই যেন সাঙ্কেতিকতা ব্যতিরেকে তাহাকে অন্য কোন প্রকারে বা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করিবার অন্য কোন পন্থা বা উপায় না থাকে। ইহা না হইলে সাঙ্কেতিকতার কোন উপযোগিতা

থাকে না। এই দুই অর্থের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে রূপক-সাহিত্য (allegory) এবং সাঙ্কেতিক বা প্রতীক সাহিত্যের (Symbolical literature) প্রভেদ আরো ভালভাবে বুঝা যাইবে। W. B. Yeats তাঁহার Ideas of Good and Evil পুস্তকে Symbolism সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

William Blake was the first writer of modern times to preach the indissoluble marriage of all great art with symbol. There had been allegorists and teachers of allegory in plenty, but the symbolic imagination, or, as Blake preferred to call it, 'vision', is not allegory, being 'a representation of what actually exists really and unchangeably'. A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame; while allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle, and belongs to fancy, and not to imagination; the one is a revelation, the other an amusement.

.. ..

.. ..

William Blake has written, 'Vision or imagination'—meaning symbolism by these words—'is a representation of what actually exists, really or unchangeably. Fable or allegory is formed by the daughters of Memory'...... Symbolism said things which could not be said so perfectly in any other way, and needed but a right instinct for its understanding; while Allegory said things which could

be said as well, or better, in another way, and needed a right knowledge for its understanding. The one gave dumb things voices, and bodiless things bodies; while the other read a meaning—which had never lacked its voice or its body—into something heard or seen, and loved less for the meaning than for its own sake.

রূপকের ভিতর যে দুইটি আখ্যান পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্পষ্ট আখ্যানভাগ এবং অন্তর্গত আখ্যানভাগ—এই দুইয়ের মধ্যে কোন সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই—ইহারা পরস্পর একেবারে বিচ্ছিন্ন। প্রত্যেক চরিত্র বা ঘটনা এবং স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির স্পষ্ট আখ্যানভাগের দিক দিয়া যে সার্থকতা, বৈশিষ্ট্য বা উপযোগিতা আছে তাহার সহিত রূপক আখ্যানভাগের সহিত কোন মিল বা সংযোগ নাই। ইহা একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন—ইহার আবার নিজস্ব সার্থকতা, বৈশিষ্ট্য এবং উপযোগিতা আছে। উদারণস্বরূপ—The Pilgrim's Progress বইটি লওয়া যাক। স্পষ্টার্থের দিক দিয়া ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়—কোন এক ব্যক্তি পৃথিবীর দুঃসহ দুর্গম পথে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নানা বাধা-বিঘ্ন-বিপদসঙ্কুল সেই ভ্রমণ কাহিনীই স্পষ্ট আখ্যানভাগের বিষয়বস্তু। রূপকের ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় ইহার বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক। পার্থিব জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জগতে যাইবার পথে আত্মাকে নানা বাধা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়—ইহা তাহারই কাহিনী। স্পষ্টার্থ ও ব্যঙ্গার্থের মধ্যে কোনই সংযোগ নাই। দুইটি আখ্যানই স্বসম্পূর্ণ। দুইটি সমান্তরাল রেখার মত, এক অন্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পথে পাশাপাশি চলিতেছে—কোন স্থানেই কেহ কাহারো সহিত যুক্ত হয় নাই এবং কাহারো মর্য্যাদা বা আভিজাত্য কম নহে। সাঙ্কেতিক-সাহিত্যের বেলায় দুইটি আখ্যান-

ভাগকে এ-ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। তাহারা কখনো বিযুক্ত আবার কখনো যুক্ত হইয়া পড়ে। স্পষ্টার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ স্বসম্পূর্ণ এবং আপনাতে আপনি প্রধান নয়। এক ব্যতিরেকে অপরকে বোঝা যায় না—দুইয়ে মিলিয়া তবে কাহিনীর পূর্ণতা আনে। মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ যদি ব্যঙ্গার্থের দিকে চালিত না করে, তবে তাহার ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইবে। ব্যঙ্গার্থকে বাচ্যার্থের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিতে হইবে—ইহারা পরস্পরের সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত—এককে বাদ দিয়া অন্যের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যে কোন সাঙ্কেতিক নাট্যের—যথা, রাজা, ডাকঘর, The Sunken Bell—কথা ভাবিয়া দেখিলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। সকল সমস্যা-প্রধান নাটকেই, চরিত্রগুলি প্রায়ই টাইপ-চরিত্র রূপে সৃষ্ট হইয়া থাকে। এক দলের লোক দেখা যায় যাঁহারা অতিমাত্রায় ভাব-প্রবণ—কঠিন বাস্তবজগতের পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া ইঁহাদের জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। 'হ্যামলেট্' এই জাতীয় চরিত্রের প্রতীক। পৃথিবীতে চিরকালই একজাতীয় লোক দেখা যায়, যাঁহারা ভাবপ্রবণ—মোহাক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের নামে যে কোন নীচ কাজ করিতে ইঁহারা পরাঙ্মুখ হন না। প্রথাকেই ইঁহারা ধর্ম্মের একটা প্রধান দিক মনে করিয়া থাকেন। 'বিসর্জ্জনে'র রঘুপতি এই জাতীয় লোকেদের সিম্বল্। তেমনি Doll's House এর নোরা চরিত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্কেত রূপায়িত। যে সকল নারী দারিদ্র্যের তাড়নায় বারবনিতার জীবিকাগ্রহণে বাধ্য হন, তাঁহাদের প্রতিভূ মিসেস্ ওয়ারেন্। এ ধরণের আরও বহু চরিত্র আছে যাঁহারা সকলেই টাইপ-চরিত্র এবং সেই হিসাবে Type Symbols। কিন্তু সাহিত্যে সাঙ্কেতিকতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি এ সকল চরিত্রে সেরূপ সাঙ্কেতিকতা নাই। প্রকৃত সাঙ্কেতিকতা বলিতে আমরা

Suggestiveness of Symbolsই বুঝিয়া থাকি। Typical Symbol ও Suggestive Symbol এর ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। টাইপ চরিত্রের দ্বারা এক জাতীয় লোককেই বোঝা যায়, ব্যক্তি বিশেষকে নয়। Allegoryর মত টাইপ চরিত্রেও দুইটি দিকের মধ্যে কোন যোগ নাই—একে অন্য হইতে পৃথক্। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সত্যকার সিম্বলের মধ্যে এই দুইটি দিককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—একটা দিকই অন্য দিককে সৃষ্টি করিয়াছে।

জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় ফরাসী দেশের সাহিত্যেই সাঙ্কেতিকতার চরম বিকাশলাভ ঘটিয়াছে। এজন্য ফরাসী সাঙ্কেতিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা ভাল। ইঁহাদের মতে সাহিত্য explicit না হইয়া suggestive হইলে তবেই তাহা আর্ট বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। এই দলীয়দের ঠিক পূর্ব্বতন সাহিত্যিক হইতেছেন Charles Baudelaire (1821-67)। ইঁহার বিখ্যাত Fleurs du Mal ও Petits Poemes en Prose পরবর্ত্তী ফরাসী সাহিত্যিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ফরাসী কাব্যে সাঙ্কেতিকতা—Paul Verlaine (1844-96) ও Stephane Mallarmé (1842-98)—ইঁহারা ফরাসী সাঙ্কেতিকদের নেতৃস্থানীয়। Verlaine এর কাব্যে তাল লয় সুর সঙ্গীত প্রভৃতির যে অপূর্ব্ব সমন্বয় এমনটা অন্য কোনো কবির মধ্যে দেখা যায় না। ব্যঞ্জনা ও মূর্চ্ছনামণ্ডিত তাঁহার কবিতাগুলি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের প্রতীক। তাঁহার Les Sanglots longs des violons, Il pleure dans mon coeur ও Lune blanche প্রভৃতি কবিতাগুলি অমরত্বের স্তরে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার Sagesse কাব্যের কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা সুধিবর্গের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া সমাদৃত। Mallarmé এর কবিতা Verlaine এর মত গীতপ্রধান নয়। ইনটেলেকচুয়াল

বলিতে যাহা বুঝায় তিনি ছিলেন তাই। যে সব তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন, সম্পূর্ণ আত্মসচেতন ভাবে সে সকলের রূপ দিয়াছেন নিজের কবিতার মধ্যে। তাঁহার লেখার মধ্যে শব্দের স্পষ্টার্থের কোন স্থান নাই—শব্দকে তিনি সঙ্কেতরূপে অন্য কিছুর আহ্বানকারী এবং নির্দ্দেশক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। পদ-যোজনা, শব্দ-গঠনের দিক অর্থাৎ Syntax প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি শব্দের সাঙ্কেতিকতার উপরই সকল গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার L'Apres-midi d'un Faune নামক কবিতাটি সকলেরই মনোহরণ করিবে।

Arthur Rimbaud (1854-91) অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় দিতে সুরু করেন। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই তাঁহার ভাল ভাল কবিতাসকল প্রকাশিত হয়। Rimbaud এর শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসাবে Le Bal des Pendus, Bateau ivre এবং গদ্য কবিতা Les Illuminations প্রসিদ্ধ। তাঁহার আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষের চরম পরিচায়ক Un Saison en Enfer. গভীরতা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির দিক দিয়া পরবর্ত্তী কবিদিগের উপর তাঁহার প্রভাব অতি সুস্পষ্টরূপেই চোখে পড়ে। এছাড়া Albert Samain (1858-1900) এবং Henri de Regnier (1864-1936) ও সাঙ্কেতিক কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। Samain অল্প লিখিয়াছেন বটে তবে তাঁহার সকল রচনাই অতি সুন্দর এবং চমৎকার বলিয়া বিবেচিত এবং সমাদৃত হইয়াছে। De Regnier অনেক লিখিয়াছেন এবং সাধারণতঃ বেশ ভালই লিখিয়াছেন। কি গদ্য কি পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।

ফরাসী নাট্যমঞ্চে সাঙ্কেতিকতা—নাট্যের ক্ষেত্রে Count Vlliers de I'Isle Adam (1840-89), Maurice Maeterlinck (1862-1949) এর পূর্ব্ববর্ত্তী। Maeterlinck এর রচনার মধ্যে Palleas et Melisande,

L'Oiseau Blue প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। Maeterlinck আরও বহু বড় নাটক, একাঙ্ক-নাটক প্রভৃতি লিখিয়াছেন—পরে বিশদভাবে তাঁহার কয়েকটি নাটকের আলোচনা দেওয়া হইবে।

Paul Claudel (1868) কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নাট্যগ্রন্থ L'Annonce Faite a Marie রচনা কৌশলের একটি অতি চমৎকার নিদর্শন। দার্শনিক Bergson (1859-1941)—সাঙ্কেতিকতার সহিত বের্গসঁ বেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত। জীবনে এবং মানব মনে Intuition ও Subconscious এর প্রভাব যে কতদূর প্রসারিত একথা প্রচার করিয়া তিনি সাঙ্কেতিকতাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করেন। Bergson এর নাম করা বই হিসাবে L'Evolution Creatrice, L'Energie Spirituelle, Duree et Simultanéite প্রসিদ্ধ।

ফরাসী সাঙ্কেতিক উপন্যাস—সংখ্যায় বেশী নয়।
কতকগুলি লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া Maurice Barrés (1862-1923) কিছু লিখিয়াছেন। বেলজিয়ান কবি Georges Rodenbach (1855-98) Bruges-la-Morte নামে একটি সাঙ্কেতিক উপন্যাসের রচয়িতা।

Symbols সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে Elizabeth Drew বলিয়াছেন—There are always two ways in which human experience can be represented in art: the way of realism and the way of symbolism. In drama this means that it can be presented directly in actual figures of flesh and blood, or it can be suggested obliquely by the creation of significant images.

মানবজীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সমূহকে দ্বিবিধ উপায়ে কলাশিল্পের ভিতর দিয়া রূপায়িত করা যায়। প্রথম উপায় বাস্তবতার

পদ্ধতি অর্থাৎ বাস্তব চিত্রের ভিতর দিয়া মনের ভাব, চিন্তা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে রূপায়িত করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি বা উপায় হইতেছে সাঙ্কেতিক পদ্ধতি—সাঙ্কেতিকতার ভিতর দিয়া মনের সঞ্চিত জ্ঞানসমূহ ও অনুভূতিপুঞ্জকে আভাসে ইঙ্গিতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা।

সকল শ্রেষ্ঠ নাটকেই এই দুই পদ্ধতি একই সঙ্গে মিলিতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রীক-নাটকের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলে এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, যে সব পৌরাণিক এবং কাল্পনিক চরিত্র গ্রীক-নাট্যের পাত্রপাত্রী, উহাদের মধ্যে একটি বাস্তবতার দিক এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সাঙ্কেতিকতার দিক আছে। বাস্তব চরিত্র বলিতে আমরা প্রাণবন্ত চরিত্রকেই বুঝিয়া থাকি; অর্থাৎ বাস্তব চরিত্রের মধ্যে জীবনের এবং সমাজের রূপ বা চিত্র অনেকটাই প্রতিফলিতভাবে রূপায়িত হয়। এই জন্যই যে কোনো যুগের সাহিত্য হইতে সেই যুগের অনেকটা বাস্তব ইতিহাসই পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া চরিত্রগুলির মধ্যে যে চিরন্তন-ভাবের দিকটা রূপায়িত হয় তাহাই নাট্যের পাত্রপাত্রীকে প্রতীক হিসাবে সৃষ্টি করিতে থাকে। সৃষ্টি করিতে থাকে বলার অর্থ এই যে যখন নাট্যগুলি প্রথম রচিত হয় তখন ঐ সব কাল্পনিক বা পৌরাণিক চরিত্রে বাস্তবতার দিকটারই প্রাধান্য থাকে। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার দিকটা আর দর্শক বা পাঠককে আকর্ষণ করিতে পারে না। কারণ এক সময়ে যাহা অতি সত্য এবং নিরতিশয় বাস্তব, পরবর্ত্তী সময়ের জীবন বা বাস্তবতার সঙ্গে তাহার যথেষ্টই মিলের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। অতীত যুগের বাস্তবতা এবং বর্ত্তমান বাস্তবতার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকিবে একথা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ নাট্যের চরিত্রগুলির বাস্তব-রূপের দিকটা বাস্তব-বৈশিষ্ট্য

হারাইতে থাকে এবং প্রতীক রূপের দিকটা নব নব যুগে নব নব ভাবের পরিস্ফুটনের ভিতর দিয়া স্পষ্ট হইতে থাকে। আধুনিক পাঠক বা দর্শকের মনে গ্রীক-নাট্যের realism এর দিকটা কোনো রেখাপাত করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না—কিন্তু symbolism এর দিকটা যে ভাবপ্রক্ষেপে তাহাদের হৃদয়ে গভীর ছাপ রাখিতে সমর্থ হয় একথা কেহই না মানিয়া পারিবেন না। উদাহরণ স্বরূপ Euripides এর Antigone নাটকটি আলোচনা করা যাক্। Antigone যে সমস্যার সম্মুখীন, আজকালকার দিনে বাস্তবতার দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার আর কোনোই মূল্য নাই—কারণ আধুনিক সমাজে কোনো ব্যক্তিরই জীবনে আর ঐ ধরণের সমস্যা আসিতে পারে না। Antigone এর ভ্রাতা Polynices হত হইয়াছেন। যদি তাঁহাকে প্রোথিত করিয়া কবর না দেওয়া হয় তবে নিজের বিবেকের কাছে, নিজের ধর্ম্মের কাছে, নিজের মনুষ্যত্বের কাছে Antigone কি উত্তর দিবেন? আবার যদি ভ্রাতার দেহ সংকার সম্পন্ন করেন তবে Thebes- এর রাজা Creon এর আইন অমান্য করা হয় এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ সুনিশ্চিত মৃত্যু। এই ধরণের পরিস্থিতি এবং জটিলতা আধুনিক জীবনে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু ভাবের গভীরতার দিকটাকে উপলব্ধি করিয়া দেখিতে হইলে নাটকটির symbolism এর দিকটা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। সে দিক দিয়া গল্পটির ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া যায় যে ইহাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বনাম রাষ্ট্রশক্তির বা রাজশক্তির ক্ষমতা-সংক্রান্ত কলহের কথা লইয়া নাটকের সমস্যা সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই দিকটাই চিরন্তন এবং সেই কারণে এই symbolism এর দিকটাই আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে এবং আনন্দ দেয়। ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতায় রাজশক্তির অন্যায় হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা রাষ্ট্রের জন্মদিবস হইতে আজও পর্য্যন্ত

অবাধে চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অত্যাচারিত প্রত্যেক মার্টার এবং বিবেক-সম্পন্ন বিদ্রোহীর প্রতীক-চরিত্র হিসাবেই চিরকাল এ ধরণের চরিত্র বাঁচিয়া থাকিবে।

ব্যক্তিবিশেষের মধ্য দিয়া টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করা, এককে বহুর প্রতীক হিসাবে দেখানো, কোনো বিশেষ কালের চরিত্রের ভিতর দিয়া চিরন্তন মানব চরিত্র সৃজন করার মধ্যে শিল্পীর শিল্পকৌশলের চরম সার্থকতা নির্ভর করে। Pastor Manders একজন অতি ক্ষুদ্রচেতা যাজক ও ধর্ম্ম উপাসক। পুরাতন জরাজীর্ণ প্রথা এবং রীতিনীতির প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধাভক্তি—অন্ধের ন্যায় বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া একটি পরিবারকে তিনি দুঃখের কালানলে নিমজ্জিত করিলেন। জগতে একদল লোক থাকেন যাঁহারা দৃষ্টিহীনের ন্যায়—কিন্তু কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া ইঁহারা অনেক সময়েই অনেককে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যান। এই সকল সনাতনীর দল জাগতিক-জীবনের বিবর্ত্তনের দিকটাকে অগ্রাহ্য করিয়াই পরম আনন্দ উপভোগ করেন। অতীতের পরিমাপের মাপকাঠিতে বর্ত্তমানকে পরিমাপ করিতে গিয়া সমস্ত কিছু গোলমাল করিয়া তোলেন। Manders এই জাতীয় চরিত্রের প্রতীক।

আধুনিক পাশ্চাত্য রঙ্গ-জগতে আর এক জাতীয় নাটকের রচনার প্রচলন হইয়াছে। এই রচনা রীতির নাম—Expressionism. এই রীতি যে সব নাট্যকার অনুসরণ করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নাটকের ভিতর symbolism কে প্রাধান্য দেওয়া। ইঁহারা নাট্যে পাত্র-পাত্রীর বিশেষ নাম উঠাইয়া দিয়া The Man, The Woman, The Nameless One, The Spirit of the Masses প্রভৃতি নামে চরিত্রগুলিকে অভিহিত করেন—সিম্‌বলিক-গ্রুপ সৃষ্টি করিয়া নাম দেন লেবার বা সোসাইটি। এভাবে লেখার জন্য নাটকগুলি অত্যন্ত অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্ হইয়া হইয়া পড়ে। এ ধরণের লেখার দোষ আছে। হয় নাটকীয় পরিণতি

অতি স্পষ্ট ও সহজ হইয়া দাঁড়ায়—যেমন The Adding Machine নাটকে—যাহার ফলে নাটকের মধ্যে দর্শক বা পাঠক আকৃষ্ট হইবার কিছুই খুঁজিয়া পায় না। পুরাতন Morality Plays গুলির মতই এগুলিকে নিরস ও একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। অথবা সমস্ত নাটকটাই এমন জটিলতাপূর্ণ হয় যে টীকাকারের ব্যাখ্যা ব্যতীত নাটকের অর্থবোধ হয় না—বিষয়বস্তু দুর্বোধ বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় রচনার উদাহরণ স্বরূপ Toller এর Man and the Masses এর নাম করা যায়। বিশ্লেষণ ব্যতীত এই ধরণের নাটকের অর্থবোধ হওয়া বেশ কষ্টকর ব্যাপার।

পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাট্যের কথাই এ পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। এবার নাট্যের স্থানে স্থানে সঙ্কেত ব্যবহার করিয়া শিল্পী বা নাট্যকার যে কিভাবে তাহার কলাকৌশলের পরিচয় দিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। অতীতে যে-ভাবে নাটক অভিনীত হইত, আধুনিক যুগের নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তাহার কোনই প্রায় মিল দেখা যায় না। অন্যান্য ব্যাপারের মত নাট্য প্রযোজনার ব্যাপারেও বিজ্ঞানের প্রভাব সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক নাট্যের টেক্‌নিক্, সেটিং বা বাই-প্লের উপর নাট্যকার যতটা নজর দেন অতীতে তাহার কোনোই আবশ্যক ছিল না এবং সেই কারণেই ঐ দিকগুলি তখন এ-ভাবে বিকশিত হইতে পারে নাই। পুরাকালের গ্রীক থিয়েটারের কথা ভাবিয়া দেখিলে একথা সহজেই বুঝা যাইবে। তখনকার দিনে যেভাবে গ্রীক-নাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল তাহাতে গ্রীক-নাটকে সূক্ষ্ম-সিম্বল ব্যবহারের কোন সুযোগই নাট্যকার পাইতেন না। সহজ ও সাধারণভাবেই তাঁহাকে সাঙ্কেতিক কৌশলের সাহায্য লইতে হইত। উদাহরণ স্বরূপ Euripides এর The Trojan Women এর কথা ধরা যাইতে পারে। যুদ্ধের যে বাস্তবতার দিকটা Homer

বিশাল ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া তাঁহার মহাকাব্যে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বিস্তৃতরূপে পরিবেশন করিয়াছেন তাহাকেই Euripides স্বকীয় আশ্চর্য্য কলাকৌশলে ছোট্ট একটি সিম্বলের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়াছেন উপরি-উক্ত নাটকের বিষাদময়ী একাকিনী নারীমূর্ত্তি এবং তাঁহার বক্ষোলগ্ন মৃত শিশুর চিত্রের ভিতর দিয়া—"in the lonely figure ot a pitiful old woman, sitting on the ground with a dead child in her arms."

এলিজাবেথীয় যুগেও রঙ্গমঞ্চের যে অবস্থা ছিল তাহাতে সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঙ্কেত ব্যবহারের সুযোগ বা সুবিধা হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের Ibsen, Tchekov ও অন্যান্য আধুনিক নাট্যকার-দিগের নাটকে সাঙ্কেতিকতা ভাবের নির্দ্দেশক ও প্রকাশক হিসাবে বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও আধুনিক নাট্য-সাহিত্য বিবর্ত্তিত হইতে হইতে যে পরিবর্ত্তিত-রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। Ibsen এর John Gabriel Borkman নাটকের সারা প্রথম অঙ্ক ধরিয়া মাথার উপরে যে পদধ্বনির শব্দ শুনা যায় তাহাতো Borkman চরিত্রেরই সমস্ত ব্যর্থতা, বেদনা ও উত্তেজনার সিম্বল ব্যতীত আর কিছু নহে। Romsersholm নাটকের বসিবার ঘরের জানালার দিকের বাহিরে যে পায়ে-চলা-ব্রিজ আছে তাহা পরিদৃশ্যমান নহে—কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই সর্ব্ব সময় সচেতন। ইহাও সিম্বল।

The Cherry Orchard নাটকে সাধরণ অর্থে আমরা প্লট বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্থান নিয়ে। মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত এবং চরিত্র চিত্রণের দিকটা মানুষের আশা আকাঙ্খার নৈরাশ্যময় পরিণতির চিরন্তন ইতিহাসই এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষ দৃশ্যে যে গাছ কাটিবার শব্দ আসিতেছে তাহা যেন

এক যুগের অবসানে নূতন যুগের আবির্ভাবেরই সঙ্কেত বা ইঙ্গিত দিতেছে। ভ্রাতা এবং ভগ্নীর জীবনের অসাফল্যের চিত্রের ভিতর দিয়া নাট্যকার মানবজীবনের বিরাট এবং গভীর হতাশার চিরন্তন কাহিনীকেই Symbolise করিয়াছেন। Madame Ranevskyর Cherry Orchard এর মত, বাস্তব-জীবনে আমাদেরও অনেক উচ্চাশা এবং গৌরবের সামগ্রী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নষ্ট হইয়া যায়। গল্প বা কাহিনী বিষাদময় হইলেও এই নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে চরিত্রগুলি। আর, সকল চরিত্রের ভিতরই এমন এক একটা অদ্ভুত দিক আছে যাহার ফলে নাটকটি tragedy না হইয়া Comedy হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের শেষ অঙ্কে একদিকে বিদায়ের ব্যথা যেমন চারিদিকে বেদনার ছায়া সঞ্চার করিয়াছে তেমনি আবার ইহারই মধ্যে Trofimovএর goloshes হারাইয়া যাওয়া এবং তাহার অন্বেষণ একটি অকারণ তরলতার সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্ত নাটকে এই দুইটি বিপরীত ভাব পাশাপাশি ভাবে রহিয়াছে—goloshes হারাইয়া যাওয়া ব্যাপারটা যেন এই তারল্যেরই ইঙ্গিত দিতেছে।

শেহভের Uncle Vanya কয়েকটি লোকের করুণ জীবনের কাহিনী লইয়াই রচিত। নাটকের মূল বক্তব্য যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে একটিমাত্র প্রতীক-ঘটনার মধ্য দিয়া—Vanya প্রফেসরের প্রতি দুই দুইবার গুলি বর্ষণ করিল অথচ একবারও সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইল না। এই ব্যর্থতাই নাটকটির প্রতি পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দাম্ভিক প্রফেসর Serebrakoff পূর্ব্ব স্ত্রীর মা, ভাই, ও মেয়েকে এমন ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন যেন কালে তিনি এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবেন। Uncle Vanyaর যখন এ বিশ্বাস ভাঙ্গিল তখন আর নিজেকে শোধরাইয়া লইবার সুযোগ বা বয়স নাই। তাঁহার

জীবনের ব্যর্থতা তাঁহার নিজের কথার ভিতর দিয়াই উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা যাক্—

Oh how I have been deceived! For years I have worshipped that miserable gout-ridden professor. Sonia and I have squeezed this estate dry for his sake. We have bartered our butter and curds and peas like misers, and have never kept a morsel for ourselves, so that we could scrape enough pennies together to send to him. I was proud of him and his learning; I received all his words and writings as inspired, and now? Now he has retired, and what is the total of his life? A blank! He is absolutely unknown, and his fame has burst like a soap-bubble. I have been deceived; I see that now, basely deceived.

প্রফেসরও অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন নিজ জীবনের ব্যর্থতা। প্রফেসরের পূর্ব্ব স্ত্রীর মাতার চরিত্র এত ব্যর্থ যে শেষ পর্য্যন্ত নিজের ভ্রান্তবিশ্বাসকেই তিনি সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া রাখিয়াছেন। প্রফেসরের দ্বিতীয়া স্ত্রী Helenaর জীবনও ব্যর্থতায় ভরা। স্বামীর পূর্ব্ব-স্ত্রীর কন্যা Sóniaর সহিত কথা প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলিতেছেন—

Helena—I swear to you I married him for love. I was fascinated by his fame and learning. I know now that it was not real love, but it seemed real at the time.

আবার অন্যত্র বলিতেছেন—As for me, I am a worthless futile woman. I have always been futile; in music, in

love, in my husband's house—in a word, in every thing. When you come to think of it, Sonia, I am really very, very unhappy.

অন্য দুইটি প্রধান চরিত্র Dr. Astroff এবং Sonia'ও জীবনে সুখী নয়। এই সকল চরিত্রের ব্যর্থতা বা অসাফল্যের দিকেই সঙ্কেত করিতেছে, গুলি ফস্‌কাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটা।

একেবারে আধুনিক কালের নাট্যের মধ্যে সিম্বলের উদাহরণ রূপে The Adding Machine এ 'number covered walls of Mr. Zero's house' এর উল্লেখ করা চলে।

Desire under the Elms নাটকের সিম্বলিজম্‌ সম্বন্ধে নাট্যকার Eugene O'neill নিজেই বলিয়াছেন—

The action of the entire play takes place in, and immediately outside of, the Cabot farm-house in New England, in the year 1850. The south end of the house faces a stone wall with a wooden gate at centre opening on a country road. The house is in good condition, but in need of paint. Its walls are a sickly greyish, the green of the shutters faded. Two enormous elms are on each side of the house. They bend their trailing branches down over the roof—they appear to protect and at the same time subdue; there is a sinister maternity in their aspect; a crushing, jealous absorption. When the wind does not keep them astir, they develop from their intimate contact with the life of man in the house an apalling humaneness. They brood oppressively over

the house, they are like exhausted women resting their *sagging* breasts and hands and hair on its roof, and when it rains their tears trickle down monotonously and rot on the shingles.

The Hairy Ape নাটকে Fifth Avenueতে যে সকল পুতুল-মানুষ দেখা যায় তাহাদের মধ্য দিয়া O'neill আধুনিক ভদ্র সমাজের নরনারীকে রূপায়িত করিয়াছেন। ইহারা যেন কেহই রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ নয়। সব কলের পুতুলের মত, প্রাণহীন জড়। মনে কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাসের বালাই নাই—যন্ত্রচালিতবৎ রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতেছে। নারীরা রুজ-পাউডার মাখা নির্জ্জীব কতগুলি পুতুলের মত। ইহারাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের নরনারীর চরিত্রের প্রতীক বা সিম্বল।

ও'নিলের The Great God Brown নাটকে mask এর ব্যবহারও সাঙ্কেতিকতায় ভরা। মানব চরিত্র প্রহেলিকাময় এবং গভীর রহস্যে আচ্ছাদিত। এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে mask ব্যবহারের ভিতর দিয়া।

Mourning Becomes Electra নাটকের লাইলাক্ বুশের সহিত জড়িত হইয়া আছে যেন ম্যানন পরিবারের কত রহস্য-রোমাঞ্চকর কাহিনী—সেই হিসাবে এই লাইলাক্ বুশও প্রতীক।

The Iceman Cometh নাটকটিও প্রতীকময়। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক নাটকেই O'neill অল্প স্বল্প প্রতীকের ব্যবহার করিয়াছেন।

ছোট ছোট সঙ্কেতের বিশেষ উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায় স্থান সঙ্কোচনের ব্যাপারে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আকার সংক্ষেপের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু নাটকের ব্যাপারে ইহার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। প্রথমত সময়ের দিক্ দিয়া বিচার করিলে নাটককে অতিবিস্তৃত

করা সম্ভব হয় না—কারণ অতিদীর্ঘ নাটক দেখিবার মত সময় বা ধৈর্য্য আজকালকার দর্শকের নাই। তাহা ছাড়া যাহা অল্পের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা চলে তাহাকে দীর্ঘ করিলে একঘেয়ে এবং বাগ্‌বাহুল্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ সঙ্কেতের ভিতর দিয়া বলিলে অনেক জিনিসেরই মূল বক্তব্যটি অতি সহজেই বোঝানো যায় এবং দর্শক বা পাঠকের মনে তাহা বেশ ভাল ভাবে গাঁথিয়া যায়। এই জন্যই Elizabeth Drew বলিয়াছেন—

The function of Symbolism in the technique of a play is really to economise space. The dramatist may use it with great artistry to create effects of contrast, and to enlarge the emotional significance of his speech, but its great value is its power to take the place of words. For, as we have seen, the main problem of the playwright is to convey everything for which the novelist can use description, or analysis, or discussion, or explanation, by the sole means of dialogue.

In this task he has the immense asset (unless he is an Expressionist !) of direct interpretation through figures of flesh and blood. His course of events, and the characters which mould and are moulded by it, are there, before us. He has no need to describe or explain or analyse them, they reveal themselves directly as they are. But on the other hand, they must reveal themselves, with force and clarity, and without waste of precious time and space. This means that there must be

the minimum of mere action and event which in no way reveals character ; and there must be the minimum of incident which merely reveals characher, without bearing any vital relation to the plot ; and there must be the minimum of the creation of setting and atmosphere for its own sake only. Again whenever an audience feels in a play that it is being talked at, the dramatist has failed in his task.

When Prospero sits down in the first act of the Tempest, and tells Miranda the story of his life ; or when Sir Peter Teazle explains the position between himself and his wife in a soliloquy, the world of dramatic illusion is shattered, and it is the dramatist's business to keep that illusion intact. It is a world built up with infinite care out of action and speech and suggestion ; the blending of character and event and setting into an organic whole. All are interdependent, and it is this interdependence, this organic unity, which is the genius of drama. The scope of its achievement is the measure of the dramatist's success, for the more passion, movement and thought he can compress into his narrow limits, the greater dramatist he will be.

Behind all dramatic technique is the effort to make these narrow limits as wide as they can possibly be. The great example of brilliance in accomplishing this in the

modern world is Ibsen. Ibsen always begins his stories immediately before some crisis in the lives of his characters, and he manages to widen the reach of the 'dramatic present' to include all the physical and emotional events of the past which are relevant to this opening situation. The dramatic illusion is never broken, but the dialogue not only distils the essence of the situation and the characters which are before us, but also gradually evokes everything which has made these people what they are, and their story what it is. So that soon the unseen past is incarnated in the imagination of the audience as vividly as the dramatic present, and becomes a living part of the movement of the actual things seen. This fusion of the inner and outward drama, the present and past, is achieved with a matchless compression and economy of means, and there is no other dramatist who is Ibsen's equal in creating organic structure. We can see the principle at work in the smallest detail of his plotting, and a very good example is given by C. K. Munro in his Watching a Play. He points out that at the opening of the third act of the Wild Duck, Ibsen makes Gina give a description of Gregers Werle's stupidity about the stove in his room : how he first forgot to open the Register and hence filled the room with smoke, and then drenched

it with water trying to put the fire out. The description of the incident provides some good comedy, and is also revealing of the general mental obtuseness of Gregers, which is the mainspring of the whole tragedy. But it plays yet another part in the general dramatic structure ; for later in the act, Gregers has to have a private conversation with his father on the stage, and without the accident to his room there would be no possible reason for their not going there to have it. So that one little incident provides variety in the dramatic atmosphere, interprets character, and contributes a necessary detail of the mechanism of the stage.

এই বার পৃথিবীর নানা দেশের নাট্যকারদের নাটকে কিভাবে সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার হইয়াছে সে বিষয় আলোচনা করিব। এইসব নাটকের অনেকগুলি পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক-নাট্য। কতকগুলিতে আবার স্থানে স্থানে সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে। আবার এমন কতকগুলি নাটক আছে যাহাতে সঙ্কেত এবং রূপকের মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার Ibsen এর কতকগুলি নাটক লইয়া আলোচনা সুরু করা যাক।

A Doll's House নাটকে আমরা type-symbols এবং pure-symbols এই দুয়েরই ব্যবহার দেখিতে পাই। আগেই বলা হইযাছে যে সমস্যামূলক নাটকের চরিত্রগুলি সব সময়েই টাইপ-চরিত্র হয়। নারীর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়া যে সংসার গড়িয়া উঠে, বাহিরের দিক দিয়া তাহাকে যতই সুন্দর দেখাক্ কিন্তু আসলে তাহা যে পুতুলের সংসার ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা মনে প্রাণে অনুভব করিয়া 'A

Doll's House' এর নায়িকা তাহার স্বামী, পুত্রকন্যা প্রভৃতির স্নেহ, মোহ, বন্ধন সকল পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগ করিল অজানার উদ্দেশে। স্ত্রী স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক এই নোরা চরিত্র। সেই হিসাবে ইহা টাইপ সিম্বল। যাইবার সময় বাহিরে দরজা বন্ধ করিয়া নোরা গৃহত্যাগ করিয়া গেল। গৃহাভ্যন্তর হইতে তাহার স্বামী Helmer, অভিনয় দেখিবার সময় দর্শকবৃন্দ এবং পাঠকালে পাঠক—সকলেই এই দরজা বন্ধের শব্দ শুনিতে পাইলেন। এই দরজার আওয়াজের ব্যাপারটাও সিম্বল (Symbol)—তবে ইহা suggestive বা pure symbol নয়, typical symbol. ইহা আভাস বা ইঙ্গিত দিতেছে না—যাহা বুঝাইবার তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝাইতেছে। আবদ্ধ আবহাওয়া পূর্ণ সংসার—যে গৃহে স্ত্রী স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়—সে গৃহকে আধুনিক নারী যে কারাগৃহের মতই দেখে এবং সেখানকার জীবনকে দাসত্বেরই নামান্তর মনে করিয়া সে গৃহ পরিত্যাগ করে, ইহারই সঙ্কেত দিতেছে নোরার যাইবার সময়কার দরজা বন্ধ করিবার শব্দ। ইহা আধুনিকাদের একটি বিশেষ মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক এবং সেই কারণেই typical. কিন্তু এই নাটকেরই Tarantella নৃত্যটি suggestive বা pure symbol. ইহা একপ্রকারের ঘূর্ণা-নৃত্য। [Tarantella সম্বন্ধে The Concise Oxford Dictionaryতে বলা হইয়াছে—Tarantella—(music for) rapid whirling Italian dance for one couple. Tarantula—Large spider of S. Europe whose bite was formerly held to cause tarantism Tarantism—Dancing mania, esp. that originating in S. Italy, among those who (thought they) had been bitten by the tarantula.]

এই ঘূর্ণানৃত্য একদিকে নোরার চরিত্রের অমূর্ত্ত ভাবনা-চিন্তা-কল্পনা প্রভৃতির প্রতীক, আবার অন্যদিকে যে অজানা রহস্যময় ভবিষ্যৎ এবং

নিয়তির বুকে সে ঘূর্ণাবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িবে তাহারও আভাস দিতেছে। ইহাই প্রকৃত সঙ্কেত।

The Wild Duck নাটকটিতেও Ibsen যথেষ্ট সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই এবিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা হইয়াছে। নাটকটিকে বিশদ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্—Old Ekdal জীবনের প্রায় প্রারম্ভে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে গোলমালে জড়িত হইয়া পড়েন এবং শেষে এজন্য তাঁহাকে জেলে পর্য্যন্ত যাইতে হয়। এই ব্যবসাতে ধনী সওদাগর Werleও তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন। Werle ও তাহার পুত্র Gregers Werleএর কথাবার্ত্তা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে Ekdal এর গণ্ডগোলের ব্যাপারটার পিছনে Werle এর যথেষ্ট চক্রান্ত আছে। জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর Ekdal একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন। সাধারণ বুদ্ধি-শুদ্ধি তাঁহার সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়া যায় এবং মনুষ্য-সমাজ হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক-ধরণের অদ্ভুত জীবন যাপন করিতে থাকেন। সাধারণ জীবনে তিনি বিখ্যাত শিকারী ছিলেন—বহু বড় বড় জানোয়ার শিকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। এখন garret এর মধ্যে নকল বন সৃষ্টি করিয়া সেখানেই খরগোস শিকার করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। এই নকল বনে Ekdal পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের বিষয় একটি wild duck—Werle ইহাকে শিকার করিতে গিয়া গুলি ঠিক-ভাবে না লাগায়, পাখীটি না মরিয়া আহত হয় এবং Werle এর ভৃত্য Pettersen এর নিকট হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিয়া Ekdal পাখীটিকে নিজের garret এর মধ্যে আনিয়া রাখেন। Werle এর দ্বারা আহত পাখীটিও এখানে থাকিতে থাকিতে এই জীবনেই অভ্যস্ত হইয়া যায়—নিজের স্বাভাবিক পূর্ব্ব জীবন অর্থাৎ—খোলা হাওয়া-বাতাসের মধ্যে উড়িয়া বেড়ান, বনে জঙ্গলে বিচরণ, আকাশের বুকে ভাসিয়া বেড়ান—

এই সকল স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হইয়া নিঃসঙ্গভাবেই জীবন কাটাইতে থাকে। এই wild duck এর ভিতর দিয়া নাট্যকার যেন Old Ekdal এরই করুণ জীবনের কাহিনীটিকে ইঙ্গিতের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতেছেন। Old Ekdal ও পাখীটিরই মত Werle এর দ্বারা আহত হইয়া স্বাভাবিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী নিঃসঙ্গভাবে অস্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। আবার Hialmar Ekdalও অন্যভাবে Werle এর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। Hialmar এর স্ত্রী Ginaর সহিত কাম লালসা চরিতার্থ করিয়া Werle তাহাকে কৌশলের সহিত Hialmarএর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন, যাহাতে পরে নিজেকে বিপদে পড়িতে না হয়। অবশ্য ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের জন্যও তিনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু এ-সকল ইতিহাস Gregers Werleএর কাছে না জানা পর্য্যন্ত Hialmar এর একেবারে অজানা ছিল। সেই হিসাবে তাহার জীবনেরও প্রতীক যেন এই একই wild duck. Gregers যখন Fourth Act এ বলিলেন —You have much of the wild duck in you, Hialmar,—তখন Hialmar নিজেই উত্তর দিলেন—Yes ; Mr. Werle's wing-broken victim.

The Master Builder নাটকটি Ibsen এর বেশ পরিণত বয়সের লেখা। ইহা তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রথম হইতেই সমালোচকগণ—ইহাতে নাট্যকারের প্রকৃত বক্তব্য কি—এবিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াও একমত হইতে পারেন নাই। নাটকটির প্রথম দিকটাতে অবশ্য কোনই জটিলতা নাই একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। নূতন যুগের আবির্ভাবের ভীতি Master Builder Solness এর বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—এই নূতন যুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে হইবে অনেক কিছুর

পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন। এই সকল পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনকে বাধা দিবার জন্য Solness দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই জন্যই সে Ragnar এর উন্নতির পথে নানারূপ বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছে; কিন্তু সত্য সত্যই যখন নবযুগের প্রতিভূ হিসাবে Hilda প্রবেশ করিল, তখন তাহাকে বেশ সহজভাবেই Solness গ্রহণ করিল। এই পর্য্যন্ত নাটকটিতে বুঝিবার কিছু অসুবিধা নাই। মতদ্বৈধ সুরু হইল পরের অংশ লইয়া। Solness দশ বৎসর পূর্ব্বে Hilda-কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে দশবৎসর গত হইলে তিনি তাহাকে একটি রাজ্য দিবেন এবং তাহার রাজকুমারী বানাইয়া দিবেন। এই ব্যাপারটি লইয়াই যত জটিলতার সৃষ্টি। Ibsen এর symbols লইয়া নানাজনের নানা মত। কেহ হয়তো একরূপ অর্থ করিল—অন্যদল তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার অন্যরূপ অর্থের দ্বারা সঙ্কেতকে স্পষ্টতর করিতে চেষ্টা করিল। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিরেক হয় নাই। কাহারো কাহারো মতে Hilda হইতেছে Solness এর যৌবনের উচ্চাশার প্রতীক। বাত্যাতাড়িত বৃক্ষ পত্রের ন্যায় Hilda তাহাকে ধাবিত করিয়াছে অসম্ভবের দিকে। মরুভূমির মাঝে মরীচিকা যেমন পথিককে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়, তেমনি এই Hilda-প্ররোচিত উচ্চাশাও Solness-কে উদভ্রান্ত করিয়া সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়া তাহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে চরম পরাজয়ের গ্লানি এবং কালিমা। ফলে তাহার স্বপ্নের-প্রাসাদ বালির প্রাসাদের মতই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। আবার অন্য এক দলের মতে Hilda যৌবনাবেগের প্রতীক্। কোন্ জিনিষটা বাস্তব এবং কাহাকে আয়ত্তের অধীনে আনা যায় সে সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। Hildaর এই উন্মত্ত যৌবনাবেগের তাড়না ও প্ররোচনাতেই Solness হতবুদ্ধি হইয়া নিজেকে ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছে। আর

একদল মত পোষণ করেন যে সমগ্র নাটকটিই Ibsen এর নিজের জীবনের শিল্পী-রূপেরই প্রতীক।

Rosmersholm নাটকের Footbridge এর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা যেন অদৃশ্য অথচ অপরিহার্য্য নিয়তির মত। মৃত্যুকে যেমন লোকে বিভীষিকাবৎ এড়াইয়া চলিতে চায় তেমনি Pastor Rosmer প্রথমাবধিই mill-race এর উপরিস্থিত এই Footbridge হইতে দূরে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। আবার সেই Footbridge এর উপর হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি ও Rebecca জীবনের সমস্ত জটিলতা ও বীভৎসতাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। এইভাবেই Rosmer পত্নী Beataও মৃত্যুর ভিতর দিয়াই জীবনের ব্যর্থতা ও অশান্তির পরিসমাপ্তি বা অবসান ঘটাইয়াছিলেন। নাটকটি দেখিবার বা পড়িবার সময় এই Footbridge এর অস্তিত্ব ক্ষণে ক্ষণেই মনে না আসিয়া পারে না। সমস্ত নাটকটি ব্যাপিয়া ইহার প্রভাব—মৃত্যুর মতই ইহা যেন রহস্যাবৃত, সুনিশ্চিতরূপে বিদ্যমান এবং সকল ক্লান্তি ও চিন্তার মহা-অবসান।

Hedda Gabler নাটকে Hedda বারবার মানসপটে Eilert-Lovborg এর যে মূর্ত্তিকে রূপ পরিগ্রহ করিতে দেখিয়াছে তাহার শিরোভূষণ কতকগুলি vine-leaves। এই vine-leaves এর ব্যাপার-টাও প্রতীক। পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার রীতিতে vine-leaves এর সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে একটা বন্যতার ভাব এবং সুরার দেবতা Bacchus এর উৎসবাদির ইতিহাস। প্রতীকের এই পুরাতন-ভাবার্থের দিকটাকে Ibsen অগ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু এই প্রতীকটিকে আরো সূক্ষ্মরূপে ভাবার্থব্যঞ্জক করিয়া তুলিয়াছেন। এই নাটকে কল্পনা শক্তির চরম উৎকর্ষ, ভাবের গভীরত্ব, শঙ্কাহীনতার দুর্জ্জয়তা বা সকল নিয়ম প্রথা প্রভৃতিকে রহিত করিয়া যে সর্ব্বনাশরূপ নূতন পথের ইঙ্গিত দেয়—এই

সকলেরই প্রতীকরূপে Ibsen vine-leaves এর ব্যবহার করিয়াছেন। Hedda নিজেকে এসকল বৃত্তি হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়াছে—সে অতিমাত্রায় সাংসারিক হইবার প্রচেষ্টা করিয়াছে—অহঙ্কার এবং আত্মাভিমান পূর্ণ তাহার অদ্ভুত চরিত্র কিন্তু কিছুতেই Eilert Lovborg কে স্বতন্ত্রভাবে নিজের পথে চলিতে দিল না। অবশ্য Eilert Lovborg চরিত্রের গুণাবলীকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার ক্ষমতা Heddaর নিজের মধ্যে নাই। নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে যে অনুভূতির তীব্রতা, কল্পনা এবং প্রতিভার আদর্শ সমন্বয় জন্মিতে পারে, এসকল কথা Eilert নিজে এবং Thea যতটা সত্যভাবে অনুভব করিয়াছিল Hedda তাহা পারে নাই। যেটুকু সে বুঝিয়াছিল তাহা বিচ্ছুরিত আলোকের দুই একটি শিখার ন্যায়—সম্পূর্ণ আলোকের রূপ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। ইহা বুঝাইবার জন্যই vine-leaves এর সঙ্কেতের অবতারণা।

এবার German নাট্যকার Gerhart Hauptmann-এর প্রতীক নাট্যগুলির আলোচনা করা যাক। প্রথমেই অধ্যাপক Ludwig Lewisohn এই নাটকগুলির ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিছুটা তুলিয়া দেওয়া গেল—

The exclusive predominance of naturalism in the modern drama was singularly brief. In France it may be said never to have existed ; in Germany it was publicly broken by the far reaching success of Ludwig Fulda's Der Talisman in 1892. All the intellectual currents of these years flowed in one direction. In 1895 Brunetière declared the bankruptcy of positivistic science in its attempt to satisfy man's deeper needs. At the same time influences as sharply divided from each other as

Neitzsche's and Anatole France's combined to discredit the theory of art which had been defended on the ground of its analogy to the sciences of observation. The New idealism, was to be sure, not very robust. It was neither aggressive nor hopeful. Like Pragmatism in philosophy, it was, often enough, a shirking of the austerer issues of thought.

"Si tu gardes ta foi, qúimporte qúelle mente ?"

Thus Anatole France had written even in the verses of his youth. But timid, wavering, uncertain of itself as it was, the new movement spread from country to country. Maeterlinck began to weave his unearthly dreams ; Isben was confirmed in the tendency to symbolism that germinates in the plays of his middle-period ; Strindburg turned mystic ; Rostand gave new life to the romantic drama in verse. Various as these manifestations were, they sprang from a common weariness of the hardness of truth and the pitilessness of life. Hannele, The Sunken Bell and Henry of Aue are in many respects, Hauptmann's most notable contribution to the neo-romantic movement in modern literature. Stern and consistent naturalist though he was, and has, in many of his works, continued to be, the new movement liberated a whole side of his temperament. The mysticism of his Silesian ancestors was stirred to a new life ; the pent-up poet could write verse again.

প্রথমেই Hannele নাটকটির কথা মনে আসে। ইহার ব্যঙ্গার্থ নায়িকার স্বপ্নের ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়াছে—এইজন্যই ইহাকে a dream poem বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নায়িকা Hannele Mattern চতুর্দ্দশ বয়স্কা কিশোরী—তাহার মা মৃতা, বাপ মদ্যপ এবং অত্যন্ত অত্যাচারী। গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করিয়াও Hannele-কে বাপের মদের পয়সা যোগাড় করিয়া আনিতে হয়। পয়সা না দিতে পারিলে বাপ Mattern তাহার পিঠের ছাল আস্ত রাখে না। Hannele এর দেহ জলে ভাসিতে দেখিয়া কাঠুরিয়া Seidel তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে। স্কুলমাষ্টার Gottwald বাড়ী ফিরিবার পথে এই ব্যাপার দেখিতে পায় এবং তখন উভয়ে গ্রামের আতুরালয়ে মরণাপন্ন Hannele কে লইয়া আসে। যথানিয়মে সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। ক্লান্তি ও পরিশ্রমে অল্পক্ষণেই Hannele ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। নিদারুণ দুঃখকষ্টের পর সে যেন মুক্তির আলোক দেখিতে পায়। নিজের কাছে লইয়া যাইবার জন্য ভগবান মৃত্যুদূতকে তাহার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মৃত্যুভয় আমাদের একটা সংস্কারের মত। সে বুঝিতে পারিতেছে যে মৃত্যুর ভিতর দিয়াই সে চরম শান্তি লাভ করিবে, তবুও যেন তাহার অল্প অল্প ভয় হইতেছে। এখানে মূল নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ হইতে অল্প কিছুটা তুলিয়া দেওয়া গেল।

Hannele

Mother ! Mother ! There's some one in the room !

Deaconess

Where ?

Hannele

There — There !

Deaconess

Why do you tremble so ?

Hannele

I'm afraid.

Deaconess

Fear nothing. I am with you.

Hannele

My teeth are chattering. I can't help it, mother ?
He terrifies me !

Deaconess

Fear not, my child. He is your friend.

Hannele

Who is it, mother ?

Deaconess

Do you not know him ?

Hannele

Who is he ?

Deaconess

He is Death !

Hannele

Death [She stares fixed and fearfully at the Angel for a moment.]
Must it — must it be ?

Deaconess

Death is the gate, Hannele !

Hannele

Is there, no other, mother dear ?

Deaconess

There is no other.

Hannele

Will you be cruel to me, Death ?—He won't answer ! Why won't he answer any of my questions, mother ?

Deaconess

The voice of God has answered you already.

Hannele

Oh, dear Lord God, I have so often longed for this. But now—now I am afraid !

পার্থিব জীবন দুঃখময়। এই জীবন হইতে মুক্তিলাভের জন্য মানবহৃদয়ের যে ব্যাকুলতা তাহাই Hannele চরিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। এই নাটকটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের ভাবগত সাদৃশ্য আছে। অসুস্থতার জন্য অমলকে বাহিরের পৃথিবী হইতে দূরে, নিজের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই ধরণের জীবন তাহার পক্ষে বিষময় এবং প্রাণান্তকর। তাহার আত্মাও মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তুলনামূলক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। দুইটি নাটকেই মানবাত্মাকে শিশুর ভিতর দিয়া রূপায়িত করা হইয়াছে। Hannele-এর আত্মা মুক্তি খুঁজিতেছে স্থূল-অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া—আর অমলের আত্মা হাঁপাইয়া উঠিয়াছে বদ্ধ আবহাওয়ায় নিষ্পেষিত হইয়া। অমলের ব্যাপারটা যেন আরো উচ্চস্তরের, আরো কাব্যময় এবং আরো ভাবাবেগপূর্ণ।

'The Sunken Bell' হাউপ্‌ট্‌মানের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাঙ্কেতিক নাটক। Bell-Founder Heinrich যখন তাহার শ্রেষ্ঠ ঘণ্টাটি পাহাড়ের উপরিস্থিত টাওয়ারে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিল, তখন উহা উপর হইতে বহু নিম্নে পড়িয়া গেল—অকৃতকার্য্যতার গ্লানিতে Heinrich এর মন বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। তাহার অদৃষ্টের চরম পরিহাস এই যে, কেহই বুঝিতে পারিল না তাহার জীবনের এই অতি কঠোর পরম পরাজয়ের ইতিহাস। একটি ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে !…তাহাতে আর এমন কি ক্ষতি ? এই হইল সকলের মনের ধারণা। Heinrich বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত নূতন ঘণ্টা সে বানাইতে পারিবে। এই নাটকের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গার্থ অতি চমৎকার। মানুষ আদর্শবাদী। যে আদর্শ লইয়া সে কাজ করিতে যায়, তাহা কখনও চরিতার্থ হয় না। প্রত্যেক শিল্পীর বিষয়েই এ কথা খাটে। অপরে হয়তো শিল্পীর কাজ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু সত্যকার শিল্পী কখনও নিজের স্বপ্নময় আদর্শের সহিত তুলনায় স্বকৃত সৃষ্টির মধ্যে perfection (চরম পরিণতি বা পরিতৃপ্তি) খুঁজিয়া পান না। কি যেন একটা অভাব, এবং অপরিণতি সকল কিছুকে নষ্ট করিয়া দেয়—এই জন্যই মন গ্লানিতে ভরিয়া যায়। অনুবাদক Ludwig Lewisohn এই নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

The Sunken Bell—(1896)

The play is the drama of the creative thinker of Modern Times. The problem of the modern artist and thinker is—as Hauptmann has shown in *Lonely Lives* and again, quite recently, in *Gabriel Schilling's Flight*—the conflict between the personal life and ideal ends. However blended with other motifs—the kernel

of the play is there. The faith by which Heinrich, the bell-founder, lives, is the presence in him of the creative power.

"What's germed within me's worthy of the blessing—
Worthy the ripening"

His one aim is to see that germ ripen, regardless of the world and its rewards, regardless of his personal happiness. To understand the play, it is necessary to understand the reality and sincerity of that conception. To the true artist, all forms and features of life, all beauty and success, bring only a deeper pang, if his central aim is unrealised. And it is this truth, which the homely environment of Heinrich's personal life fails to understand and to support. His bell falls into the mere. And Magda, his wife, says :

"Pray Heaven, that be the worst !
What matters one bell more or less ! If he,
The Master, be but safe !"

The master is alive, though full of despair, because the bell—he knows—was hurled down the hills by no mere chance.

"Twas for the valley, not the mountain-top !"

And to this cry of the artist's despair his wife replies :

"That is not true ! Hadst thou but heard as I
The vicar tell the clerk in tones that shook :
'How gloriously it will sound upon the heights' !"

The opinion of the vicar and the clerk are her norm. Of the unapproached ideal she knows nothing. Thus Heinrich, driven by what is deepest in him, goes into the hills and finds in nature a spirit of beauty and refreshment—Rautendelein—who will help him to find his treasure. There is no hardness of heart in him. He cannot help Magda, for to her "his wine would be but bitter gall and venom." He stays upon those heights with Rautendelein to build the great work that shall embody his dreams. The ignorant cries of hidebound men serve only to convince him more—"Of the great weight and purpose of his mission." And yet he fails. It is the tragedy of his too human soul. For he has really left his heart, his earthly affections, in the valleys of his other life :

"Yonder I am at home.......and yet a stranger—
Here I am strange.........and yet I am at home."

His children bring their mother's tears up the mountainside, and the Sunken bell, stirred by her dead hand, tolls the destruction of his hopes. And yet he dies, clasping the ideal with all his strength. For it is better to die so than to return to the valleys where the ideal is a stranger and an outcast.

মানুষ শিল্পী, মানুষ স্রষ্টা। এই তাহার সব চেয়ে বড় পরিচয়—এই তাহার সকল গৌরবের বড় গৌরব। ক্রমাগত সে নিজেকে

সৃষ্টির ভিতর দিয়া বিকশিত ও প্রকাশিত করার চেষ্টা করিতেছে। ভাবকে রূপান্বিত করিবার জন্য সে নিরন্তর ব্যাকুল, সীমার ভিতর দিয়া অসীমকে পাওয়ার জন্য সে সর্ব্বক্ষণ কী ব্যগ্র, খণ্ডের ভিতর দিয়া অখণ্ডের কল্পনায় সে সকল সময় সচেষ্ট। মানব-চরিত্রের এই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একটা দিক ইহাই যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে নায়ক Heinrich এর চরিত্রে। নাটকটির ছত্রে ছত্রে ব্যঞ্জনা, মূর্চ্ছনা এবং সঙ্গীতের লহরী বহিয়া চলিয়াছে। তাহা ছাড়া সমস্ত নাটকটি ব্যাপিয়া একটি ব্যাকুলতা ও বেদনার সুর আছে; ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই বেদনার সুরটিই সকল কিছুকে ক্রন্দনময় করিয়া তুলিতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের সকল কিছুই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্ট। তাঁহার সৃষ্টির ভিতর কোন খুঁত নাই, অভাব নাই, অসম্পূর্ণতা নাই। কিন্তু মানুষ তো দেবতা নহে। তাহার সৃষ্টিতে যে অসম্পূর্ণতা থাকিবেই থাকিবে। তাহা না হইলে সে নিজেই তো দেবতা হইয়া দাঁড়াইত। এই অসার্থকতার ফলেই বেদনার সৃষ্টি। এই বেদনার অনুভূতি চিরকাল তাহার জীবনের সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে। মানুষের কৃত শিল্প কখনো দেবশিল্পের ন্যায় সম্পূর্ণ এবং সার্থক হইতে পারে না—কারণ ইহা তো মৌলিক শিল্প নয়। ইহা যে দেবশিল্পের অনুকৃতি। উভয়ের মধ্যে তফাৎ যে থাকিতেই হইবে। এই সকল আধ্যাত্মিকতার কথা অতি চমৎকার ভাবে ইঙ্গিতের দ্বারা বলা হইয়াছে The Sunken Bell নাটকটিতে। Hauptmannএর Henry of Aue নাটকটি জগতের নাট্যসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সাধারণতঃ পাশ্চাত্যের সাঙ্কেতিক নাট্যগুলি পড়িয়া দেখা যায় যে ইহাদের স্পষ্ট আখ্যানভাগের দিকটা বড়ই জোলো-জোলো এবং একঘেয়ে লাগে। একমাত্র Hauptmann এর Symbolical plays গুলিতেই এ দোষ নাই—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ দুইই সুন্দর লাগে এবং পড়িবার পর মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। Henry of Aueর স্পষ্ট আখ্যান-

ভাগ এই—Count Henry দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনমধ্যে, নিঃসঙ্গভাবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, দুর্ব্বিসহ জীবনের বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করার মানসে নিজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আসেন। বালিকা Ottegebeর প্রেম, স্বার্থত্যাগ ও ভক্তির মহিমায় Henryও মন হইতে সকল অহঙ্কার গর্ব্ব দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া পূর্ণমাত্রায় ভগবদ্বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। ভগবৎপদে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের ফলে Henry ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া দুরন্ত ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করেন। নিজের স্বর্গীয় প্রেমের প্রভাবেই Ottegebe এই অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হন।

ইহার গুপ্ত আখ্যানভাগ বোধ হয় এই কথাই বুঝাইতে চাহিতেছে যে মানুষ যতদিন না প্রেমের প্রভাবে চৈতন্য লাভ করিয়া ঈশ্বরপদে নিজেকে সমর্পণ করিতে শিখিতেছে, ততদিন তাহার অবস্থা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সর্ব্বসুখবঞ্চিত হতভাগ্য ব্যক্তিদের মতই শোচনীয়। যতদিন না সর্ব্ব অহঙ্কার দ্বেষাদি বর্জ্জন করিয়া সে ঈশ্বরের অপার প্রেম উপলব্ধি করিতে শেখে ততদিন তাহার মুক্তি নাই। ততদিন সে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত—কোন কিছুতেই তখন সে আনন্দ পাইতে পারে না। এই নাটকটি সম্বন্ধে অনুবাদক Ludwig Lewisohn লিখিয়াছেন—The fable of Henry of Aue (1902) is a simpler one. The play's message—if so inapt a word may be applied to a work of art—is larger, and is curiously allied to certain tendencies in contemporary philosophy. For the crux of the play is this : How Henry is healed of his fatal ill ? The mediaeval miracle of blood is rejected. The process of his healing begins when hate and despair leave his soul ; the good comes with his belief in its

possibility. *His will helps the beneficence that is* at the core of things. That will to believe arises first in Ottegebe, then in him. To both it is revealed that

"The heavenly seeming is the heavenly truth."

It is quite possible to regard the healing of the leper as symbolical despite the concrete reality of the play's characters and action. Yet it remains true that Hauptmann here sounds the least uncertain note of spiritual hope in the entire neo-romantic movement and allies himself unmistakably with ancient sanctities treasured in the heart of the race.

"O Hartmann, like a soulless husk of flesh,
An evil wizard's creature of dead slime,
And not God's child—fashioned of stone or brass—
Such art thou till the pure, ethereal stream
Of the divine has poured its living fire
Into the hull mysterious which hides
The miracle of being from our ken.
Then art thou thrilled with life. Unfettered, free,
The immortal light fills full thy mortal breast,
Radiantly breaking through thy prison's walls,
Redeeming, melting thee and all thy world
In the eternal universe of love."

.. .. ..
.. .. ..
.. .. ..

There is little doubt but that this play will ultimately rank as the most satisfying poetic drama of its time. Less derivative and uncertain in quality than the plays of Stephen Phillips, less fantastic and externally brilliant than those of Rostand, it has a soundness of subject matter, a serene nobility of mood, a solidity of verse technique above the reach of either the French or English poet. Hauptmann chose as his subject the legend known for nearly seven hundred years through the beautiful Middle High German poem of Hartmann von der Aue—the legend of that great knight and lord who was smitten with leprosy, and whom according to the mediaeval belief, a pure maiden desired to heal through the shedding of her blood. But God, before the sacrifice could be consummated, cleansed the Knight's body and permitted to him and the maiden a united temporal happiness. This story Hauptmann takes exactly as he finds it. But the characters are made to live with a new life. The stark mediaeval conventions are broken and the old legend becomes living truth. The maiden is changed from an infant saint being in a vale of tears into a girl in whom the first sweet passions of life blend into an exaltation half sexual and half religious, but pure with the purity of a great flame. The miracle too remains, but it is the miracle of love that subdues

the despairing heart, that reconciles man to his universe, and that slays the imperiousness of self. Thus Henry, firmly individualised as he is, becomes in some sense, like all the greater protagonists of the drama, the spirit of man confronting eternal and recurrent problems. The minor figures—Gottfried, Brigitte, Ottacker—have the homely and delightful truth that is the gift of naturalism to modern literature.

এরপর জগদ্বিখ্যাত সাঙ্কেতিক নাট্যকার মেটারলিঙ্কের কয়েকটি নাটকের আলোচনা করা হইবে। মেটারলিঙ্ক যে সাধারণ নাটক লিখেন নাই এমন নহে তবে তাঁহার নাট্যের মধ্যে বেশীর ভাগই সাঙ্কেতিক নাট্য। Yeats বার বার যে অবচেতনতার কথা বলিয়াছেন Maeterlinck এর মনে তাহার সমধিক প্রাধান্য। এইখানে রবীন্দ্রনাথ এবং Hauptmann এর সহিত Yeats এবং Maeterlinck এর যথেষ্ট তফাৎ। রবীন্দ্রনাথ ও Hauptmann এর রচনায় অধিচেতন মনের প্রভাব বেশী। অবচেতনতা নাই একথা বলিতেছি না; তবে রাজা, রক্তকরবী, Henry of Aue বা The Sunken Bell প্রভৃতি যে ধরণের নাটক, The Sightless, The Interior, The Land of Heart's Desire প্রভৃতি যে সেই ধরণের নহে একথা কে অস্বীকার করিবে?

Maeterlinck—1862–1949.

The Princess Maleine (1889)—Grimm's Fairy Tales এর একটি গল্পের উপর ভিত্তি করিয়া এই নাটকটি রচিত। অনেকে এই নাটকটির সহিত Hamlet এর অনেকাংশে মিল দেখিতে পান। রাজ্ঞী Gertrudeএর মত এ নাটকেও আছেন রাজ্ঞী Anne—ইনি জাটল্যাণ্ডের সিংহাসনচ্যুতা রাণী—Yesselmondeএ রাজা Hjalmar এর রাজসভায়

আসিয়া আশ্রয় নিয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহার হাতের ক্রীড়নকের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছেন। Anne যুবরাজ Hjalmar-কেও ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। রাজা Marcellus এর কন্যা রাজকুমারী Maleine এর সহিত যুবরাজ Hjalmar এর বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিবাহের ভোজ সভায় বৈবাহিক দুই রাজায় বাধিল গণ্ডগোল এবং যুদ্ধ। রাজা Hjalmar, Marcellus-কে বধ করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ সুরু হইবার পূর্ব্বে রাজকুমারী Maleine যুবরাজ Hjalmar-কে ভুলিয়া যাইতে অস্বীকার করায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার ধাত্রীর সহিত একটি কক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। দেওয়ালের পাথর আল্‌গা করিয়া ইঁহারা মুক্ত হন এবং Yesselmondeএর প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হন। Maleine আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া Anne এর কন্যা রাজকন্যা Uglyane এর পরিচারিকার পদ গ্রহণ করেন। Uglyane এর সহিত কুমার Hjalmar-এর বিবাহ প্রায় স্থির, এমন সময় কুমারের কাছে Maleine নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন—কুমার পিতার কাছে সকল কথা বলে এবং পুনর্ব্বার ইহাদের বিবাহের সব ঠিকঠাক করা হয়। রাণী Anne বাহিরে Maleine-এর সহিত ভাব দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে তাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করে। এবিষয়ে আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়া ফাঁস দিয়া দমবন্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করে। যুবরাজ, Maleine-এর মৃত দেহ দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রাণী Anne কে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া নিজেও আত্মঘাতী হন।

চরিত্রগুলির কথোপকথনে বোঝা যায়, যাহা তাহারা বলিতেছে তাহা ছাড়াও অনেক কথা তাহাদের বলিবার আছে—অর্থাৎ মনের ভাবগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তথাপি অকথিত বাণীগুলি নৈঃশব্দের ভিতর দিয়াই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে।

প্রকৃতির বুকে এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও সকল কিছুই যেন রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নকমাত্র এই কথাই যেন নাট্যকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন। নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোনই ফল পাওয়া যায় না। Maleine মানবাত্মার প্রতীক—ক্রূর নিয়তির পদদলিত অবহেলিত শিকার মাত্র। রাজা ও যুবরাজ Hjalmar'ও নিয়তির উপর নির্ভরশীল দুর্ব্বল জীব। Anne রূপ অস্ত্রের প্রয়োগের দ্বারাই বারম্বার নিয়তি পুতুল-মানুষদের জীবনে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে। মানুষ দুর্ব্বল, অসহায় এবং অসমর্থ—নিজের দ্বারা সে পরিচালিত নয়—বাহিরের এক অজানা রহস্যময় শক্তিই তাহাকে পরিচালিত করিতেছে। সমস্ত জীবন ধরিয়া ....there is no retribution and no reward ....there is only Fate .

The Sightless নাটকটি ১৮৯০ সালে রচিত। মৃত্যুর রহস্য নাটকটির একটি প্রতিপাদ্য বিষয় সন্দেহ নাই, তবে জীবন-রহস্য এবং জীবন-ধারার বৈচিত্র্য ও নানা অভিজ্ঞতার ব্যাপার গুলিই প্রাধান্য পাইয়াছে। এই নাটকে—"this earthly existence is conceived as a deep, impenetrable night of ignorance and uncertainty.

—Is van Dijk, Maurice Materlinck—pp. 81-82"

স্থান—উত্তর দেশের এক বনানী—উপরে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিরাজ করিতেছে গ্রহ-নক্ষত্রাদি খচিত আকাশ। বনমধ্যে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক—কালো অঙ্গাবরণে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত। শিরোদেশ এবং দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গ একটি বিরাট শুষ্ক-বৃক্ষের গুড়িতে ঠেসান দিয়া তিনি বসিয়াছেন। তাঁহার মুখ রক্তশূন্য ও মোমের মত সাদা—নীল ওষ্ঠদ্বয় অর্দ্ধমুক্ত—নানা দুঃসহ বেদনাভারে যেন চক্ষু ফাটিয়া রক্ত ঝরিবার উপক্রম হইয়াছে। আঁখিতারকাদ্বয় নিঃস্পন্দ ও নিথর—দৃশ্যজগতকে দেখিবার শক্তি আর তাহাদের নাই। শুভ্র স্বল্পাবশিষ্ট

কেশরাশি মুখের ওপর পড়িয়া যেন যাজকের ক্লান্তি এবং অবসন্নতার ভাবটিকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক নির্জ্জনতায় পূর্ণ—ইহাতে যেন চারিদিকে একটা রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। যাজকের হস্তদ্বয় জানুর উপর ন্যস্ত হইয়া অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পরস্পরে যুক্ত হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণে ছয়জন অন্ধব্যক্তি, কেহ পাথরের উপর, কেহ বৃক্ষকাণ্ডের, আবার কেহ শুষ্কপত্রের উপর উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। বামে কিছু দূরে ইহাদের মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে ছয়জন অন্ধ নারী। তাহাদের মধ্যে তিনজন ক্রমাগত প্রার্থনা করিতেছে এবং গোঙাইয়া গোঙাইয়া ক্রন্দন করিতেছে। চতুর্থ নারী অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছে। পঞ্চম রমণী বাতুল এবং নির্ব্বাক। তাহার কোলে একটি নিদ্রিত শিশু রহিয়াছে। ষষ্ঠটি যুবতী এবং অতি সুন্দরী। তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া বন্যাধারার ন্যায় কেশরাশির গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহারা সকলেই যেন উদ্গ্রীব হইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। নানারকমের গাছের ছায়া পড়িয়া ইহাদের সকলকে অন্ধকারাবৃত করিয়াছে। ঘন তমসায় চারিদিক অতি ভয়াবহ এবং রহস্যময় দেখাইতেছে। অন্ধের দলের ধারণা যাজক ঐ স্থানে নাই—এজন্য তাহারা তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। যাজক সম্বন্ধে তাহাদের মনে যে সব ধারণা হইতেছে, কথাবার্ত্তায় তাহা প্রকাশ পাইতেছে—

উনি বড় বেশী বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন!

সম্প্রতি বোধহয় উঁহারও দৃষ্টিশক্তি বিশেষ ভাল নাই।

বোধ হয় যাজক পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

অনেক্ষণ অবধি হাঁটিয়া আসিয়া তাহারা এখানে পৌছিয়াছে—সুতরাং আশ্রয়স্থল হইতে নিশ্চয় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

যাজক আজকাল কেবল রমণীদিগের সহিতই বাক্যালাপ করেন —সুতরাং উহারাই বলিতে পারিবে তিনি কোথায় গিয়াছেন।

কিন্তু নারীরাও তাহা জানেন না। যাজক শুধু তাহাদের বলিয়াছেন যে শীতের পূর্ব্বে শেষবারের মত একবার দ্বীপটিকে দেখিয়া লইবেন।

ঝড়ে নদীতে বন্যার সৃষ্টি করায় এবং dyke গুলি ভাঙ্গিবার উপক্রম হওয়ায় যাজক বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। উনি তবে সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছেন—সমুদ্র নিশ্চয়ই খুব নিকটে—নিজেরা স্তব্ধ হইলেই পাথরের উপর ঢেউয়ের আঘাতের শব্দ পাওয়া যায়।

উহারা নিজেরা এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে কেহই বলিতে সমর্থ নয়। কতকাল আগে তাহারা এই দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল! কেহই এবিষয়ে কিছুই জানে না—সকলে অন্ধ অবস্থায় এখানে আসিয়াছিল। কেহই এ দ্বীপে জন্মায় নাই—সকলেই সমুদ্র-পারের দেশ হইতে আসিয়াছে। তাহাদের আশ্রয়স্থলের ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিল—বারটা বাজিবার ঘণ্টা পড়িল—কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিল না এ দ্বিপ্রহরের না মধ্যরাত্রির ঘণ্টাধ্বনি। সামান্য শব্দেই অন্ধের দল ভীত এবং সচকিত হইয়া উঠিতেছে। হঠাৎ ঝড় আরম্ভ হইল—সমুদ্র পাহাড়ের বুকে যেন আছড়াইয়া পড়িতেছে। শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছে সমুদ্র তাহাদের অতি নিকটে—এখনি আসিয়া সকলকে গ্রাস করিবে। তাহারা এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল—এমন সময় শুষ্কপত্রের উপর পদধ্বনি শোনা গেল। এ শব্দ তাহাদের আশ্রয়স্থলের বড় কুকুরটির পদশব্দ। একজন অন্ধের জানুর উপরে কুকুরটি সামনের পায়ের থাবাগুলি ন্যস্ত করিল। কুকুরটি আকর্ষণ করিতেছে অনুভব করিয়া উক্ত অন্ধ ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিয়া নিস্তব্ধ, স্থাণু যাজকের সম্মুখে উপস্থিত হইল

এবং তাঁহার তুহিন-শীতল মুখে হাত দিয়া অনুভব করিল যে যাজকের মৃত্যু হইয়াছে। কুকুরটি মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইতে রাজী নয়। শুষ্ক পত্রাবলীকে ঘূর্ণি-হাওয়ায় ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরাইতে লাগিল। এমন সময়ে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। তাহাদের মনে হইতেছে যেন তাহারা পদধ্বনি শুনিতেছে। পদধ্বনি যেন তাহাদের মাঝে নামিয়া আসিল।

ইহা পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটক। মৃত ধর্ম্মযাজক রিলিজিয়ানের প্রতীক। মানবজীবনে বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম মৃতপ্রায়। ধর্ম্মই একদিন মানুষকে পরিচালিত করিত—মানুষের পথপ্রদর্শকের কাজ করিত। চালকের অভাবে আজ আমরা অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। "There is something which moves above our heads, but we cannot reach it." যে সীমাবদ্ধ জড়জীবনের মাঝে আমরা নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, অসীম সাগরের বারিরাশি তাহার তটরেখা অতিক্রম করিয়া আসিয়া সকল কিছুকে সিক্ত করিয়া দিতেছে। যে সকল সময় মানব মন শান্ত এবং স্তব্ধ এবং সমাহিত অবস্থার মধ্যে নীত হয় তখনই অসীমের কলরোল শুনিয়া সে ত্রস্ত এবং বিস্মিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইতে থাকে। একস্থানে অরণ্যের বৃক্ষাবলীকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে একটি লাইট হাউসের শিরোদেশ। এই লাইট হাউস জ্ঞানের প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা আমাদের আশ্রয়স্থল ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া আসিয়াছি। আশ্রয়স্থল বলিতে বুঝাইতেছে সেই মঙ্গলময় অবস্থা যাহা আমাদের পক্ষে একটা পরম নির্ভরের মত ছিল এবং যে অবস্থায় শুধু ধর্ম্মের নির্দ্দেশেই উপনীত হওয়া যায়। ইহাদের দলে একমাত্র শিশুটিরই দৃষ্টিশক্তি আছে কিন্তু সে তো এখনো কথা বলিতে পারে না। ইহাতে মূক ভবিষ্যতের কথাই ইঙ্গিতে বোঝান হইতেছে। উপহাসের

ভঙ্গীতে মানুষের দোষত্রুটি সম্বন্ধে আভাস দেওয়া হইয়াছে। Jethro Bithell এই নাটকটি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—One blind man, when he goes out in the sunshine, suspects the great radiances ; another prefers to stay near the good coal fire in the refectory....The oldest blind woman dreams sometimes that she sees ; the oldest blind man only sees when he dreams....The young beauty smells the scent of flowers around them (the promptings of sense guide us ; and the beautiful are the sensuous ; one who was born blind only smells the scent of the earth.. .. ..

..........Heaven is mentioned, and all raise their heads towards the sky, except the three who were born blind—they keep their faces bent earthwards........

The Intruder (1890)—মৃত্যুই জীবনের পরিচালক এবং মৃত্যু ব্যতীত জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। মৃত্যুর স্বরূপ যে বোঝে তাহার কাছে ইহা কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনা নয়—মৃত্যু এক রহস্যে ভরা রোমাঞ্চকর ঘটনা। সসীম জগতের সর্ব্বত্রই মৃত্যুর রূপ ভয়াবহ—মৃত্যুর ভিতর দিয়াই সসীমকে অতিক্রম করিয়া অসীমকে পাওয়া যায়। যে সকল রহস্যময় অজানা শক্তি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে মৃত্যু তাহাদের মধ্যে একটি। এই জাতীয় অপর একটি শক্তির নাম প্রেম। এই দুইটি cosmic শক্তির ব্যাখ্যানে Maeterlinck কয়েকটি নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

রহস্যজনকভাবে মৃত্যুর অভ্যাগমবর্ণনই The Intruder নাটকের বিষয়বস্তু। এ নাটকের Grandfather চরিত্রটি দৃষ্টি-শক্তিহীন। The Intruder এবং The Sightless—এই দুই

নাটকেই বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে আমরা সকলেই দৃষ্টিশক্তি হীন—অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি—আমাদের মধ্যে বাহ্যতঃ যাহারা সব চেয়ে কম দেখে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই যৎসামান্য তবু কিছু দেখিতে পায়। অর্থাৎ বাহির হইতে দেখিয়া দেখার সার্থকতা আসে না—অন্তর হইতে দেখিতে পারিলে তবেই ঠিকমত দেখা হইবে। এই প্রসঙ্গে 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউলের কথা মনে আসে। সে চোখে দেখিতে পায় না বলিয়াই ভিতর হইতে দেখিতে পায়।

নাটকের গল্পাংশ এইরূপ :—এক পুরাতন প্রাসাদের একটি অন্ধকার কক্ষে The Blind Grandfather, The Father, The Uncle, and The Three Daughters বসিয়া রহিয়াছেন। পাশের ঘরে The Mother শুইয়া আছেন—ইনি প্রসূতি এবং অসুস্থা। প্রায় মরণের দ্বার হইতে যেন ইঁহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে—ডাক্তাররা বলিতেছেন যে এখন আর বিপদাশঙ্কা নাই। সকলেই একথায় আশ্বস্ত হইয়াছেন, কেবল Grandfather এর মনে সংশয় রহিয়াছে—তাঁহার ধারণা রোগীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। The Uncle নবজাত শিশুটি সম্বন্ধেই বেশী চিন্তান্বিত—জন্মের পর হইতেই প্রায় নড়েচড়ে নাই, একবারও কাঁদে নাই, যেন মোমে তৈয়ারী শিশু। সকলেই the Sister এর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। The Eldest Daughter জানালার বাহিরে তাকাইয়া দেখিতেছে তিনি আসিতেছেন কিনা। বাহিরের পথ নানা বৃক্ষাদিশোভিত। সে বাহির হইতে বুলবুলপাখির গান, বাতাসের মৃদুশব্দ এবং গাছের পাতার মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে পাইতেছে। The Grandfather বলিয়া উঠিলেন যে তিনি আর বুলবুলের গানের শব্দ শুনিতে পাইতেছেন না—The Daughter এর মনে ভয় হইতেছে অপরিচিত কেহ গৃহসংলগ্ন বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। কাহাকেও সে দেখিতে পায় নাই বটে, তবে নিশ্চয়ই কেহ পুষ্করিণীর পাশ দিয়া

গিয়াছে—হাঁসগুলি ভয় পাইয়াছে এবং মাছের দলের জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া উঠিবার শব্দ পাওয়া গিয়াছে। কুকুরের দল নিস্তব্ধ—এ গৃহের কুকুরটি তাহার ঘরের কাছে কুঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। বুল-বুলের কূজন বন্ধ হইয়া গিয়াছে—চারিদিকে মৃত্যুর করাল নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

The Grandfather বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চয়ই কোন অপরিচিত শয়তান আমাদের এভাবে ভয় দেখাইতেছে। বাগানে ফোটা গোলাপের পাপড়িগুলি ঝরিয়া পড়িয়া গেল। Grandfather অত্যন্ত শৈত্যানুভব করিতেছেন—অথচ বারান্দার দিকের কাঁচের দরজাটি বন্ধ করা যাইতেছে না। মিস্ত্রি আসিয়া পরের দিন এই দরজাটি সারাইয়া দিবার কথা। হঠাৎ বাহির হইতে কাস্তেতে শান দিবার আওয়াজ পাওয়া গেল।—মালি নিশ্চয়ই তাহার যন্ত্রপাতিতে ধার দিয়া ঠিক করিয়া রাখিতেছে! বাতির আলো প্রায় নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে,—কে যেন এ-গৃহে প্রবেশ করিল বলিয়া মনে হইল—কিন্তু সিঁড়িতে তো কই কাহারও পদধ্বনি শোনা গেল না। তাহারা চাকর-ডাকা ঘন্টি বাজাইল।

দাসীর পদশব্দ শোনা গেল—Grandfather এর মনে হইল দাসী একা আসিতেছে না—সঙ্গে অপর কেহ আছে। The Father দ্বার খুলিয়া দিলেন—দাসী সেই খানেই অপেক্ষা করিয়া রহিল—কই—কেহ তো তাহার সঙ্গে নাই!—সে তো নিঃসঙ্গভাবেই আসিয়াছে। দাসী বলিল কেহই বাহির হইতে গৃহে প্রবেশ করে নাই—কিন্তু নীচের দরজা খোলা-অবস্থাতেই ছিল এবং সে-ই তাহা বন্ধ করিয়া আসিয়াছে। The Father তাহাকে দরজা নাড়িয়া আওয়াজ করিতে বারণ করাতে দাসী বলিল সে তো দরজা নাড়িতেছে না। The Grandfather—যদিও অন্ধ তবুও

অনুভবের দ্বারা আলোকের অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন—ভাবিলেন বোধ হয় ইহারা ঘরের আলোটি নিবাইয়া দিতেছে। তাছাড়া তাঁহার মনে হইতেছে নিশ্চয় কেহ এ ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—আলো কেন নিবাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার ভয়ানক আগ্রহ হইল পাশের ঘরে রুগ্নাকে দেখিয়া আসিবেন—ইঁহারা বাধা দিলেন—এখন রোগী ঘুমাইতেছেন। এবার বাতিটি সত্য সত্যই নিবিয়া গেল—সকলে জমাট অন্ধকারের মধ্যে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনির শব্দ পাওয়া গেল—শেষ ধ্বনিটির সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা আওয়াজ শোনা গেল। পাশের ঘরে শিশুটি ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রুগ্নার ঘর হইতে দ্রুত পদবিক্ষেপের শব্দ শোনা গেল—ঘরের দরজা খুলিয়া গেল—এবং ও-ঘর হইতে আলোকের শিখা এ-ঘরে আসিয়া পড়িল—প্রবেশ পথে আবির্ভূতা হইলেন একজন Sister of Charity—তিনি Sign of the Cross করিয়া Mother এর মৃত্যু ঘোষণা করিলেন। নাট্যকারের কলাকৌশলে অলৌকিক ঘটনাগুলিকে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কাস্তেতে শান দিতেছে Reaper Death নয়—বাড়ীর মালী। আলো নিবিয়া গেল কোন অস্বাভাবিক কারণে নয়—তৈল ফুরাইয়া যাওয়াতে। তবু সমস্ত পরিবেশটি ব্যাপিয়া বাস্তবকে ছাপাইয়া যেন এক অতিবাস্তবতার রেশ মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। মৃত্যুর করাল অভ্যাগমকে আরো ভয়াবহ, আরো রহস্যঘন করিয়া তুলিয়াছে চারিদিকের বিরাজমান স্তব্ধতার অন্তর্লীন রহস্য।

The Seven Princesses (1891)—একটি বিরাট মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত ঘর ; চতুর্দ্দিকে লরেল, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতির পল্লবদ্বারা সজ্জিত —Porcelain এর পুষ্পপাত্রগুলি লিলিপুষ্পে শোভিত। সাদা

marble এর সিঁড়ির উপর শুভ্র-বাস-পরিহিতা সাতটী রাজকন্যা শুইয়া আছেন—এক একজন এক একটি সিঁড়ির উপর ফ্যাকাসে সিল্কের তোষকে শুইয়া নিদ্রামগ্না। পাছে অন্ধকারের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিলে জাগিয়া উঠিয়া ভয় পাইয়া যান, এজন্য তাঁহারা রৌপ্য নির্ম্মিত একটী দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। এই দীপালোক আসিয়া নিদ্রামগ্নাদের দেহের উপর পড়িয়া এক রোমাঞ্চকর স্বপ্নাবেশপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। নিদ্রার অবস্থার ভিতরে থাকিয়াই ইহারা যেন স্বাভাবিক—ইহারা যেন জাগ্রত থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই—ইহারা কত দুর্ব্বল! এই নিদারুণ দৌর্ব্বল্যই যেন পরিশ্রান্তি এবং ক্লান্তি অপনোদনের জন্য নিদ্রার বুকে ইহাদের বিশ্রামের জন্য পাঠাইয়াছে। এস্থানে আসিবার পর হইতেই এই রাজকন্যারা যেন শক্তিহীন, দুর্ব্বল এবং উৎসাহ-হীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বদেশস্থিত এই রাজপ্রসাদটির সর্ব্বত্র হিমশীতল এবং স্বপ্নের যাদুতে ভরা। ইহারা গরমের দেশ হইতে এখানে আসিয়াছে। সর্ব্বসময় সূর্য্যের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিয়াছে—কিন্তু সূর্য্যের দর্শন কখনো ভালভাবে ঘটিয়া উঠে নাই—এখানকার আকাশও নির্ম্মল এবং সুন্দর নহে—পুষ্করিণীগুলির পাশে পাশে ওকের এবং পাইনের ঘন জঙ্গলের সার—সব মিলিয়া এক ভয়াভহ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতেছে। গৃহে ফিরিবার ব্যাকুলতায় শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হইয়া কন্যারা নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের পারিপার্শ্বিকের সকল কিছুই এত পুরাতন। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে করিতে তাহাদের জীবন যেন হতাশা এবং ক্লান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা সত্য সত্যই অতি শ্রান্ত, অতি দুর্ব্বল এবং জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাহাদের যৌবনের সাথীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে কিছুকাল হইতে। সময় সময় তাহারা উদগ্রীব হইয়াছে কখন

দূরের ক্যানালে এই সাথীর জাহাজ দেখা দেয়। আবার নিজেরাই বলাবলি করিয়াছে কই—সে তো আসিল না!

অবশেষে তাহারা যখন সকলে নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন সে আসিল। ইহাদের এখন জাগ্রত করা যায় কিরূপে! জানালার বাহির হইতে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে উঁকি দিয়া সে ইহাদের সাতজনকে দেখিতে লাগিল। এই সাতজনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী Ursula—বাল্যাবস্থায় ইহারই সহিত খেলা করিতে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসিত। দীর্ঘ সাতবৎসর ধরিয়া এই কন্যা তাহার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছে—দিবারাত্র ধরিয়া এই সুদীর্ঘ সাতবৎসর। সাতজনে হাত ধরাধরি করিয়া শুইয়া আছে—তাহারা যেন ভয় পাইয়াছে পাছে নিজেদের মধ্যে কেহ হারাইয়া যায়। তথাপি তাহারা নিদ্রাবেশে নড়াচড়া করিয়াছে—কারণ Ursula র হাত অন্য দুই ভগ্নীর হাত হইতে মুক্ত। অবশেষে ভূগর্ভস্থ একটি পথ দিয়া কুমার এ কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল এবং ছয়জন কুমারী জাগিয়া উঠিয়া হর্ষধ্বনি করিল—"কুমার আসিয়াছে!" কিন্তু Ursula জাগিল না—তাহার দেহ নিথর নিস্তব্ধ নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়াও কুমার না আসাতে এবং আত্মার মিলনাকাঙ্খা অপূর্ণ রহিয়া যাওয়াতে অবসাদে, হতাশায়, ক্লান্তিতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

আমাদের অন্তরদেশই এই রাজপ্রাসাদ। এই নিদ্রারতা সুন্দরীদের দ্বারা মানবাত্মাকেই বুঝাইতেছে। মানবাত্মা কখনো নিদ্রাবেশে পূর্ণ থাকে—কখনো আবার স্বপ্নমগ্ন হয় এবং প্রতীক্ষা করিতে থাকে সেই পরমপুরুষের যিনি জীবনস্বামীরূপে আসিয়া নিদ্রার মোহ দূর করিবেন এবং প্রেমাবেগে ইহাকে পুষ্ট ও প্রাণবন্ত রাখিবেন। এই সাতটি কন্যা মানবাত্মার বিভিন্নদিকের নির্দ্দেশক। সমালোচক

G. Hulsman এই নাটকটি সম্বন্ধে মনে করেন—Maeterlinck must have thought of the Buddhistic idea, according to which the human soul consists of : the breath of God, the word, the thought, Psyche, the power of living, appearance, and the body.

Ursula, the middle sister, is Psyche, that is, the real self, the deepest, the essential in our being. This real self is unconsious and unknowable. Let the ideal come, no ideal can unveil the deepest. It is dead to us.

আবার কেহ কেহ ইহাকে Solar-myth হিসাবেও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

Palléas et Mélisande প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। বৃদ্ধ Arkél Allemande-র রাজা—তাহার দুই পৌত্রের নাম Golaud ও Palléas। ইহাদের মায়ের নাম Geneviére. Golaud এর পূর্ব্ব স্ত্রীর পুত্রের নাম Yniold. একটী আহত বন্য বরাহের অনুসরণ করিতে করিতে Golaud বনমধ্যে পথ হারাইয়া ফেলেন এবং এক ঝরণার ধারে ক্রন্দনরতা Melisande কে দেখিতে পান। তাহার পূর্ণ সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও Golaud তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া আসেন। Palléas কে দেখিবার পর হইতেই Melisande দুঃখাক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং Palléas-এর দূরদেশে যাওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নয় এইরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি স্বামীকে জানান যে তাঁহার মনের সুখ নষ্ট হইয়াছে কিন্তু কেন হইয়াছে তাহার কোনও কারণ দর্শাইতে সমর্থ হন না। Golaud এর নিষেধ সত্ত্বেও Palléas ও Melisande নিজেরা দেখাসাক্ষাৎ করিতে থাকেন। Golaud এর শিশুপুত্র দেখিতে পায় যে ইঁহারা

দুইজনে অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। এক সময় যখন Melisande উপরের খোলা জানালা দিয়া দীর্ঘ কেশরাশি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন এবং নীচে দাঁড়াইয়া Palléas সেই কেশে চুম্বন করিতেছিলেন—এমন সময় Golaud সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ভ্রাতাকে সাবধান করিয়া দেন এবং ইহা শিশুজনোচিত ব্যবহার বলিয়া উপেক্ষা করেন। ঝরণার ধারে চুম্বনরত এই প্রেমিক প্রেমিকাকে ধরিয়া ফেলিয়া Golaud Palléas কে হত্যা এবং Mellisande কে আহত করেন। একটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি শিশুকন্যার জন্ম দিয়া Melisande শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

চতুর্দ্দিক বনানী, পর্ব্বত এবং ঝরণা প্রভৃতির দ্বারা শোভিত। এ-সকলের সমাবেশে এক স্বপ্নময় কাহিনীর সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষের জীবনে ভবিতব্য যে কত বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং এই ভবিতব্যকে ছাড়াইয়া উঠা যে আমাদের পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য এ ইঙ্গিত Maeterlinck-এর বহু নাটকেই পাওয়া যায়। এই নাটকের চরিত্রগুলিও এক অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। জীবনকে বুঝিতে হইলে বাহির হইতে দেখিলে চলিবে না—অন্তর্মুখী হইতে হইবে। বিবাহের পর Golaud যে চিঠি দিলেন তাহা শুনিয়া Arkel বলিলেন—"He has done what he probably had to do. I am very old, and yet I have never for one instant seen clearly within myself ; how then would you have me judge the deeds of others ? I am not far from the grave, and I am incapable of judging myself....One is always mistaken unless one shuts one's eyes."

এবং

.........Let it be as he willed : I have never put

myself in the way of a destiny ; and he knows his own future better than I do. There is no such thing. perhaps, as the occurrence of purposeless events."

Palléas এক জায়গায় বলিতেছে—"We cannot do as we wish." আবার Melisande বলিতেছেন—"I dont myself understand all that I say, do you see."

এই নাটকটি সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে Edward Thomas লিখিয়াছেন—

.....When the child is trying to lift a rock to release a ball he says : "It is heavier than all the world......It is heavier than all that has happened.........I can see my golden ball between the rock and this naughty stone, and I cannot reach it......My arm is not long enough.. ......and the stone will not be lifted......I cannot lift it......and there is nobody that could lift it......"Not content with this, the child is made to see a flock of sheep coming : "How many there are !......They are afraid of the dark......They huddle together !...... They all want to turn to the right......They may not ! Their shepherd is throwing earth at them..........Ah ! ah !......They are obeying."

Symbols, symbols ! It is the triumph of Maeterlinck that these symbols, though exaggerated, are never out of harmony. They are all variations of one theme—the littleness, the impotence, the lostness of mankind.

এই নাটক সম্বন্ধে সমালোচক Jethro Bithell বলিয়াছেন...... in Palléas & Melisanda death is the bourne to which Love drives his sheep. The sheep do not know whither they are being driven ; when they come to cross-roads, they do not know which to take, but they do feel, dimly, that they are not on the road to the fold. Hence the tragedy of their emotions ; and it is the state of the soul filled with love, as tragic and as mystical a consciousness or sub-consciousness as that of the soul in the clutch of fate or in the shadow of death, that Maeterlinck projects into Palléas and Melisanda as into Alladine and Palomides and Aglavaine and Selysette. We have nothing to do here with morality or the laws which regulate marriage. The soul knows nothing of such things ; is unconscious even of the sins of the body. The soul is subject only to such laws as are inherent in itself : "the secret laws of antipathy or of sympathy, elective or instinctive affinities." The soul, remembering the fair sunny clime from which it came, pining in the cold air of the marshlands, groping about helplessly in the dark, always meeting closed doors, always gazing through glass at the unattainable, is an eternal searcher for the light ; and if it meets a comrade who has the key to the closed door of its happiness, or who holds the lamp to light its path, it will follow the gleam blindly. It must do, for that is

the law of its being. The tragedy lies in this : that it follows the gleam blindly, and the gleam leads it—at all events at present, because alien souls come athwart the path it is following—into the abyss of night. Civic laws were made to fetter the body ; but the soul has no consciousness of the body, of the senses, and cannot therefore be fettered by civic laws. So long as you hold that love is a function of the soul, and not of the senses, you cannot call Francesca da Ramini or Melisanda faithless wives. In your philosophy they are not on the road to adultery, but to the happiness for which their soul cries out, and to which it has inalienable right.

.. .. ..

We find them (Palleas and Melisanda) under an old lime-tree in the dense, discreet forest, at the "Fountain of the Blind" (They are blind) .. .. ..

.. ..

Her union with Golaud is an external bond ; but her soul knows nothing of things external, her soul is innocent of whatever her mouth may say to a man who is a stranger to her soul. এই জন্যই সে স্বামীর কাছে মিথ্যা বলিতে দ্বিধা করে নাই। পরে যখন Melisanda টাওয়ারের জানালার ধারে বসিয়া কেশ প্রসাধন করিতেছিল—Doves (thc doves of the body's chastity, perhaps !) come out of the tower and fly around them. Melisanda-র মৃত্যুর পর বৃদ্ধ রাজা Arkel—এই

চরিত্রটি নাটকে জ্ঞানের প্রতীক—অদৃষ্টবাদপূর্ণ এই কথাগুলি বলিয়া নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন :—

"She was so tranquil, so timid, and so silent a little being......she was a mysterious little being like everybody else........She lies there as though she were the big sister of her child......Come away, come away........My God! My God!... ....I shall not be able to uuderstand anything any more........Don't let us stay here.—Come away; the child must not stay in this room. ......It must live now, in its turn......It's the poor little one's turn now... .. .. .."

Aglavaine and Selysette—Le Tresor des Humbles যে বৎসরে রচিত সেই বৎসরেই প্রকাশিত হয় (1896). দুইটি নারীর মধ্য দিয়া যেন আত্মার সৌন্দর্য্যের প্রতিদ্বন্দিতা দেখানো হইয়াছে। Selysette-এর সহজ সারল্যকে জ্ঞানের আলোকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল Aglavaine এর প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল এই সহজ সারল্যের অন্তরে যে শক্তি লুকায়িত থাকে জ্ঞান বা বুদ্ধির তাহা অগোচর। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Selysette-ই এজন্য জয়ী হইল।

সমুদ্রের ধারে একটি প্রাসাদ। সেখানে বাস করে Meleandre ও তাহার স্ত্রী Selysette. বিবাহের পর চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিবাহিত জীবনে তাহারা সুখী; তবুও Meleandre নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিয়াছে তাহারা স্বামী স্ত্রী কি উভয়ে উভয়কে ঠিকমত কাছে পাইয়াছে? এমন সময় ইহাদের জীবনে উদয় হইল Aglavaine. সে বিধবা—Selysette-এর ভ্রাতৃবধূ। নিজের বিবাহিত

জীবনে সে ছিল অসুখী। ঐ প্রাসাদে সপ্তাহকাল অতিবাহিত না হইতেই Meleandre-এর মনে হইতে লাগিল যেন জন্ম হইতেই সে এবং Aglavaine একত্রিতভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। Aglavaine বুঝিতে পারে না সেই Meleandre এর নয়নের আলো, না Meleandreই তার সকল অন্ধকারের অবসানের উপায়। ইহাদের উভয়ের মধ্যে এমন একটা চারিত্রিক ঐক্য আবিষ্কৃত হইল যে ইহারা অদ্বৈত নয় একথাই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহারা চেষ্টা করিল নিজেদের মধ্যে ভাইবোনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে—কিন্তু উপলব্ধি করিল ইহা সম্ভব নয়। একে অপরকে ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইবে এমন মানসিক শক্তি নাই। Meleandre বলে—'এই যে সুন্দর প্রেম ইহা তো নষ্ট হইবার জন্য জন্ম লয় নাই এবং আমাদেরও নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্য আছে—উভয়ে উভয়কে দূরে রাখিয়া নিজেদের এ-ভাবে বঞ্চিত করিবার অধিকার আমাদের কোথায়?

দুজনের মধ্যে চুম্বন বিনিময় কালে গাছের অন্তরালে কাতরোক্তি শুনিয়া ইহারা অপস্রিয়মান Selysette-কে দেখিতে পাইল। Aglavaine তাহার জ্ঞানালোক এবং চিত্তের দৃঢ়তার দ্বারা Selysette-কে হিংসামুক্ত' করিল—দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। এরপর ইহারা তিনজনে সঙ্কল্প করিল যে এক আদর্শ প্রেমের ভিতর দিয়া পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকিবে। "We will have no other cares," says Aglavaine, "save to become as beautiful as possible, so that all the three of us may love one another the more........We will put so much beauty into ourselves and our surroundings that there will be no room left for [misfortune and sadness; and if these

would enter in spite of all they must perforce become beautiful too before they dare knock at our door."

তিনটি আত্মা অতীন্দ্রিয় মিলনের ভিতর দিয়া পরম ঐক্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইল। Meleandre-এর মনে হইতে লাগিল যে Aglavaine এর প্রেমালিঙ্গনে তাহার অন্তরাত্মা, সমগ্র-সত্তা, এমন কি সকল কিছুর ভিতরেই এক বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়া যায়—অশ্রু বর্জনের ভিতর দিয়া সে তাহার চিন্ময় সত্তার সম্পর্কে নিজের মধ্যে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। Meleandre এবং Selysette-এর সহজ প্রেম এখন দেহাতীত চিন্ময় প্রেমের স্তরে উন্নত হইল বটে তথাপি Aglavaine-এর প্রতি ভালবাসার আধিক্যকে Meleandre সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইল। ইহার ফলে দুইজন নারীর মধ্যে একজনের অপসারণ হইল অবশ্যম্ভাবী। Aglavaine স্থির করিল নিজের স্বার্থ বিসর্জন করিয়া সে দূরে সরিয়া যাইবে। Selysette উহার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিল যে তাহাকে না জানাইয়া সে যাইতে পারিবে না। Selysette বেশ রহস্যজনকভাবে Aglavaine-কে জানাইয়া দিল যে, সে সকল সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। পরিত্যক্ত Lighthouse Tower হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া Selysette আত্মহত্যা করিল। নীচে বালুকাস্তূপের উপর পড়াতে তখনই তাহার মৃত্যু হইল না। যে অল্পকাল সে জীবিত ছিল তখন এই কথাই সে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে সে আত্মহত্যা করে নাই, দৈব বিপাকে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে পড়িয়া গিয়াছে। এই নাটকটি সম্বন্ধে Jethro Bithell বলিয়াছেন—"In the first four acts we have the doctrine of Silence, as well as various other doctrines, dinned into our ears.

Selysette is "unconscious goodness," says a critic, whereas Aglavaine is "conscious goodness"; and no doubt she does represent an idea.

.. ..

There is as much individualism as fatalism in this play. It is true that love is fatal to Selysette, but that is because Aglavaine is a monstrosity, not becouse love is a dark power—in this play it is distinctly painted as a bright power. Death is only called in as a saviour from an intolerable situation : Selysette dies, but she dies with a clear mind, and with a smile".

The Death of Tintagiles (1894)—

মানুষ ভাগ্যের বা ভবিতব্যের হাতের ক্রীড়নকের মতো। এই ভবিতব্য অজানা অন্ধকারে পূর্ণ এবং রহস্যময়। ইহার বিরুদ্ধতা করিবার মতো কোন শক্তিই মানুষের নাই। নাটকটিতে সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে এই কথাগুলিই আভাসে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করা হইয়াছে।

একটি, শিশু, মসীবর্ণের রাজপ্রাসাদ, অদৃশ্য রাণী এবং মৃত্যু এই লইয়াই নাটকটি রচিত। Tintagiles-কে সমুদ্রের একটি দ্বীপে লইয়া আসা হইয়াছে। এখানে তাহার ভগ্নী Ygraine এবং Bellangere ও জ্ঞানীবৃদ্ধ Aglovale বাস করে। রাণীর আজ্ঞায় Tinlagiles-কে এখানে আসিতে বাধ্য করা হইয়াছে কেন?—কেহ সে কথা জানে না। রাণী একটি বিরাট টাওয়ারে বাস করেন। দিবারাত্র ইহার জানালা দরজা বন্ধ থাকে। রাণী কখনও এখান হইতে নামিয়া আসেন না। রাণীর অপরিসীম শক্তি সম্বন্ধে কেহ কোন

ধারণা করিবারও ক্ষমতা রাখেন না। একথা সকলেই বুঝিতেছেন যে মৃত্যুর জন্যই শিশুটিকে এখানে আনা হইয়াছে। এই দুই ভগ্নী এবং তাহাদের ভ্রাতার একমাত্র বন্ধু হইতেছে Aglovale.

সে জানে ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিতেছে—Tintagiles-এর মৃত্যু রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই তবু যেহেতু তাহার ভগ্নীরা আশা করিতেছে যে ভাইকে বাঁচাইবে, সেজন্য Aglovale তাহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত। রাণীর অনুচরেরা শিশু Tintagiles কে অপহরণ করিতে আসিয়া বাধা পাইয়া চলিয়া গেল। পরে ইহারা সকলে যখন নিদ্রায় অভিভূত তখন রাণীর অনুচরেরা আসিয়া তাহাকে লইয়া পলাইল। মৃত্যুর হাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত Tintagiles-কে রক্ষা করা সম্ভব হইল না।

Interior (*1894*)—সমস্ত নাটকটী ব্যাপিয়া এক রহস্যময় স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। বাড়ীর একটি আলোকোজ্জ্বল ঘরে এক পরিবারের সকলে বসিয়া আছেন—The Father, The Mother, The Two Daughters এবং মায়ের কোলে শিশু। এ পরিবারেরই অপর একজন কন্যা জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। The Stranger তাহার মৃতদেহ জল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। The Stranger এবং The Greybeard সন্তর্পনে ইহাদের উইলো গাছের বাগানে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল কি ভাবে এই দুঃসংবাদ গৃহস্থ আত্মীয় স্বজনকে জানানো যায়। বাড়ীর কেহই এ সংবাদ জানে না। কি অদ্ভুত আমাদের এই জীবন! কখন কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে কে বলিতে পারে! এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহাদের আশেপাশে দেখিতেছি পরমুহূর্ত্তে হয়ত তাহাদের ভাগ্যে এমন কিছু ঘটিতে পারে যাহা জানিতেও আমাদের কিছু সময় কাটিয়া যাইবে। The Greybeard অবশেষে বাড়ীর নিকটে আসিলেন। এখানে একটি অতি স্বাভাবিক

শান্তির ভাব বিরাজমান। মায়ের কোলে শিশু নিদ্রা যাইতেছে—ভগ্নী দুইজন এম্ব্রয়ডারী করিতেছে, পিতা আগুন পোহাইতেছেন—এভাবে এই অবস্থায় এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ দেওয়াও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মৃতদেহবাহীর দল এতক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইল। The Greybeard গৃহে প্রবেশ করিলেন। দূর হইতে তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া বোঝা গেল দুঃসংবাদটি জানানো হইল। মাতা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, তারপর পরিবারস্থ সকলে দৌড়াইয়া বাহিরে আসিল। ঘরটি খালি হইয়া গেল—শুধু আরাম কেদারায় শুইয়া শিশুটি অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

আমাদের জীবনে অতি সহজ এবং সুন্দর পরিবেশ এবং অবস্থার মধ্যেও ভবিতব্যের বিধানে কি নিদারুণ এবং ভয়ঙ্কর ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে তাহারই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এই নাটকটীতে। এ সকল রোধ করিবার কোন ক্ষমতাই আমাদের নাই—দর্শকের মত আমরা শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখিয়াই যাইতে পারি। কিছু বলিতে পারি, কিছু করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের কোথায়!

Sister Beatrice (*1901*)—কনভেণ্টের যাজিকা Beatrice তাঁর প্রেমিক Bellidor-এর সহিত আশ্রম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান। কিন্তু তাঁহার এই সর্বত্যাগী প্রেমের প্রতিদানে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইলেন Bellidor-এর কাছ হইতে। কিছুদিন বাদেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ এরপর। এরপর অতি কদর্য্য এবং বেদনাময় জীবন যাপন করিতে হইল Beatrice-কে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে রূপোপজীবিনীর কুৎসিত ব্যবসা করিয়াও জীবনযাপন করিতে হইল। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে আবার তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে Virgin Mary তাঁহার

রূপ ধারণ করিয়া Beatrice-এর কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সমাধান করিয়া যাইতে লাগিলেন। আশ্রমের কেহ জানিল না যে, Beatrice সে স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি সকল কিছুই যথাযথ পূর্ব্বের মত দেখিতে পাইলেন। অন্যান্য যাজিকাদের এবং তাহাদের প্রধানার Beatrice-এর প্রতি অগাধ এবং প্রগাঢ় ভালবাসা ও প্রীতির ভাব বিদ্যমান। তিনি শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদের বুঝাইতে সমর্থ হইলেন না যে, তিনি দীর্ঘকাল বাহিরে ছিলেন এবং অতি কুৎসিৎভাবে জীবন কাটাইয়াছেন। এই স্বীকারোক্তিকে তাহারা Beatrice-এর মনের ভুল ধারণা হিসাবে দেখিল এবং ভাবিল—"This is only part of the terrible strife about great Saints." (Edward Thomas) এই নাটকটি সম্বন্ধে Jethro Bithell লিখিয়াছেন—To Mieszner, Sister Beatrice represents the human soul prisoned in prejudice." To many who have read 'The Treasure of the Humble' it will suggest itself that, we have here a spectacle of the human soul remaining pure while the body it dwells in is steeped in sin. To Anselma Heina, the nun is "one who has been made richer, one who has lived, and it m·y indeed be the poet's intention to show us that the flesh is holy and is not contaminated by fulfilling its functions.

Ardiane and Blue-beard (1907).

Blue-beard তাহার পাঁচজন স্ত্রীকে নিজের প্রাসাদের এক বৃহৎ গুহায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই পাঁচজনের সকলেই অত্যন্ত দুর্ব্বল মনোবৃত্তি সম্পন্ন—এ-ধরণের দুর্ব্বল নারী-চরিত্রের আখ্যান Materlinck-এর পূর্ব্বের নাটকগুলিতে বহু দেখা যায়। এমন কি এই

পাঁচজনের নামও আগেকার নাটকে বর্ণিত কয়েকটি নারী-চরিত্র হইতে নেওয়া হইয়াছে। Blue-beard ইহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে কিন্তু ইহারা এতই নির্জীব যে নীরবে এই বন্দিত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মুক্তিলাভের কোন প্রচেষ্টা না করিয়া ইহারা কেবল প্রার্থনা, সংগীত এবং রোদন করিয়া এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া কাল কাটাইয়াছে। পলায়নের আকাঙ্খা নাই, কারণ স্বামী নিষেধ করিয়াছে এস্থান ত্যাগ করিতে। ইহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইল Ardiane। নাট্যকারের দ্বিতীয় যুগের রচিত নারী-চরিত্রগুলির সকল বৈশিষ্ট্যই ইহার মধ্যে বিগুমান। Ardiane প্রাণবন্ত, সবল ধী-শক্তিসম্পন্ন এবং দৃঢ়চেতা। সে আসিয়াই এই সকল দুর্ব্বল নারীদের মুক্তির উপায় বাহির করিল। ঘটনা পরম্পরায় সয়তান Blue-beard যখন কৃপাপ্রার্থীরূপে ইহাদের সম্মুখে নীত হইল তখনও শাস্তি দেওয়া বা প্রতিশোধ নেওয়া দূরের কথা, ইহারাই যত্ন এবং আদরের দ্বারা তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল। বাহিরে যাইবার জন্য দ্বার খুলিয়া দিয়া অর্থাৎ মুক্তির পথ দেখাইয়া Ardiane যখন জানাইল যে, সে স্বাধীনতা লাভের জন্য বাহিরের পথে ফিরিয়া যাইতেছে এবং তাহাদেরও তাহার সঙ্গে আসিবার জন্য আহ্বান করিল তখন কেহই Blue-beard-কে ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইল না। দৈহিক বন্ধনটাই বড় কথা নয়—যাহাদের মন প্রস্তুত নয়—তাহাদের মুক্তি হইবে কি উপায়ে? উপায় যদিও বা আবিষ্কার হয় তাহাও গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবে। এই কথা ভাবিয়াই বোধ হয় নাটকটির আর একটা নাম দেওয়া হইয়াছে—The Vain Deliverance.

নারী জাতির স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় যে, অত্যাচারিত হইয়াও নারীরা অত্যাচারীকে ত্যাগ না

করিয়া তাহারই সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে ভালবাসে। এই নাটকটি সম্বন্ধে Jethro Bithell লিখিয়াছেন—An unmistakable motive of the play is that sanctification of the flesh which emblazons the breviary of the second Maeterlinck. Ardiane bares the arms and shoulder of the timid wives. "Really, my young sisters," she says, "I do not wonder that he did not love you as he ought to have done, and that he wanted a hundred wives............he had not one..............we shall have nothing to fear if we are very beautiful."

Joyzelle (*1903*)—

এই নাটকটির ভিতর রূপক এবং সঙ্কেতের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে Merlin এবং তাহার পুত্র Lanceor এবং নারীচরিত্রের মধ্যে Joyzelle ও Arielle. Arielle Merline এর প্রতিভার নারীরূপ। Merlin ব্যতীত অন্যান্যদের কাছে এ-চরিত্র অদৃশ্য। স্থান—একটি দ্বীপ যাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা Merlin. কোন কারণবশতঃ Lanceor এর সহিত তাহার পিতার পরিচয় নাই। প্রেমের সার্থকতার ভিতর দিয়াই Lanceor এর জীবনে আনন্দ সৌন্দর্য্য এবং পরিপূর্ণতা বর্ত্তমান থাকিবে। Joyzelle-ই Lanceor এর জীবনে এই চরম এবং পরম প্রেমের দূতীস্বরূপ। কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে অতি কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া প্রেমের সত্যতার প্রমাণ দিতে হইবে। Merlin ও Arielle এই প্রেমিক প্রেমিকার প্রথম সাক্ষাৎ অদৃশ্য থাকিয়া লক্ষ্য করিল। প্রেমিক যুগল উভয়েই অন্যত্র হইতে এই দ্বীপে সমাগত। Joyzelle যাহার বাগদত্তা তাহার প্রতি তাহার কোন ভালবাসা জন্মায় নাই। Lanceor-এর

জন্যও কন্যা ঠিক আছে। তাহার ধারণা তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং মৃত্যুকালে তিনি এইরূপই অভিলাষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে জানে না যে তাহার পিতা জীবিত এবং তিনিই Merlin. প্রেমবর্জ্জিত, এই পূর্ব্ব হইতে স্থির করা, সম্বন্ধের ব্যাপার Joyzelle এর কাছে অবজ্ঞাজনক। Joyzelle-এর মনে আর এক ধারণা এই যে এই দ্বীপের বৃদ্ধ ব্যক্তিটি—যে সকল সময়ই তার হারানো ছেলের চিন্তায় রত—যে এই দ্বীপের সর্ব্বময় প্রভু অর্থাৎ Merlin, সেও তাহার প্রেমে কাতর। প্রেমিক প্রেমিকার প্রথম মিলনের পর Merlin আসিয়া উভয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। Merlin Joyzelle কে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের উভয়ের মধ্যে পরিচয় আছে কিনা। Joyzelle সম্মতি প্রকাশ করিলে, কবে হইতে এ পরিচয় তাহা জানিতে চাহিলেন। উত্তরে Joyzelle জানাইলেন যদিও অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ, তাহাতেই তাহাদের মধ্যে নিবিড় পরিচয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। Merlin Joyzelle-এর প্রতি তাঁহার নিজের ভালবাসার ইঙ্গিত দিলেন এবং Lanceor-কে সাবধান করিয়া দিলেন দ্বীপের নির্দ্দিষ্ট এক গণ্ডীর বাহিরে না আসিতে—তাহার আদেশের অন্যথায় শাস্তি পাইতে হইবে একথাও বলিয়া দিলেন। তাহাদের পুনর্মিলনে Joyzelle-এর জীবনের আশঙ্কা থাকিলে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবে বলিয়া Lanceor প্রতিশ্রুতি দিল। Joyzelle কোন প্রতিজ্ঞার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। অযত্নে রক্ষিত উদ্যানমাঝে প্রেমিক প্রেমিকার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। Joyzelle কোন প্রকারেই Lanceor-কে এইস্থান হইতে চলিয়া যাইতে সম্মত করিতে পারিল না। এই মিলনে যে কত বিপদ Lanceor কিছুতেই বুঝিতে চাহিল না। উভয়ে প্রেমালিঙ্গনে

আবদ্ধ হইল। Joyzelle বলিল যে স্বপ্নের ভিতর দিয়া কতবার এই আলিঙ্গনের সুখ উপভোগ করিয়াছে। উভয়ে বর্ত্তমানের এই আনন্দকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিল এবং অতীতের সুখস্মৃতি স্বপ্নাদি ক্ষণে ক্ষণে মনে উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চারিপাশের প্রকৃতির মাঝেও অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিল। জঙ্গলী বাগান নানারকমের সুন্দর ফুলে শোভিত হইয়া উঠিল এবং পাখীর সুমধুর সঙ্গীতে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল। ইহাতে Joyzelle শঙ্কিত হইল। সে বুঝিতে পারিল প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনে Merlin-এর কাছে তাহাদের গোপন মিলনের কাহিনী আর গোপন রাখা সম্ভব হইবে না। Merlin আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া Lanceor এক ঝোপের মাঝে লুকাইল এবং সেখানে সর্পদংশনে মারাত্মকভাবে আহত হইল। এরপর Merlin তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া সুস্থ করিল। তথাপি Lanceor তাহার পিতার পরিচয় পাইল না। Arielle সুন্দরী রমণীরূপে Lanceor-কে প্রলুব্ধ করিয়া আদর্শ প্রেমের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিল। Arielle-এর এই প্রেমাভিনয়ের খেলায় Merlin বাধা দিতে সমর্থ হইল না। Joyzelle দেখিল Lanceor এবং Arielle উভয়ে উভয়ের প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ। প্রথম দিকে Lanceor এসকল অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিল, পরে বিরক্ত হইয়া Joyzelle-কে তাড়াইয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে দেখা গেল Lanceor অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। Joyzelle এর কাছে সে স্বীকার করিল যে, সে Arielle-কে চুম্বন করিয়াছে; কিন্তু ইহাও বলিল যে এক দুষ্টা মোহিনী শক্তির কাছে তাহার দেহটাই পরাভূত হইয়াছে, আত্মার কোন পরাভব ঘটে নাই। এই আত্মার সহিত Joyzelle এর পূর্ব্বেই পরিচয় ঘটিয়াছিল—তাহার উপর তাহার স্বর্গীয় প্রেম তাহাকে বুঝাইলে যে Lanceor নিজে হইতে

মিথ্যা বলিতেছে না। অপর একটি দৃশ্যে Arielle নিদ্রারতা Joyzelleকে চুম্বন করিল—নিদ্রামগ্না Joyzelle মনে করিল বুঝি Lanceorই তাহাকে চুম্বন করিতেছে। Arielle দেখিল ঘুমন্ত অবস্থাতেও Joyzelle তাহার প্রেমিকের প্রতি বিশ্বাস-হন্তা নহে।

Arielle Merlinকে Joyzelle এর প্রেমাসক্ত হইয়া আনন্দ আহরণ করিতে উপদেশ দিল। ইহা না করিলে Merlinকে Viviane এর মারাত্মক মোহিনী মায়ার জালে পড়িতে হইবে তাহাও জানাইল। Joyzelleর পবিত্র প্রেম যাহাতে নষ্ট হয় সেইজন্য Merlin তাহাকে বলিল যে Lanceor পুনরায় অন্য রমনীর বক্ষালগ্ন। এ দৃশ্য দেখিবার জন্য বলিলে Joyzelle ফিরিয়াও তাকাইলনা বা প্রতিবাদ করিল না। Joyzelle-এর কাছে Lanceor আর ভিন্ন ব্যক্তি নয়—উভয়ের যে একই সত্তা।

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় প্রাণহীন Lanceor এর দেহকে পুনর্জীবন দানের জন্য Joyzelle কত প্রকার চেষ্টায় রত। Merlin উহাকে বাঁচাইয়া দিলে Joyzelle স্বীকার করিতে রাজী যে সে আর Lanceorকে ভালবাসে না। এমন কি Merlin এর কাছে সে আত্মসমর্পণ করিবে। Merlin এই সর্তে Lanceorকে জীবনদান করিতে রাজী হইল। Merlin তাহাকে বাঁচাইল এবং ভবিতব্যের বিধানেই তাহার এই দুর্গতি একথা বলিয়া তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করিল। Joyzelle তাহার প্রেমিককে জানাইল না যে কি সর্তে সে তাহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে।

শেষ অঙ্কে দেখা যায় যে Lanceor জানিল যে Merlinই তাহার পিতা। Merlin পুত্রকে বুঝাইয়া দিল যে ভবিতব্যের বিধানেই সব কিছু ঘটিয়াছে। ইহা শুনিয়া Lanceor খুবই আনন্দিত হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন শুনিল যে এখনও Joyzclle-এর চরম পরীক্ষার বাকী আছে তখন

আবার বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। Arielle Merlinকে এই চরম পরীক্ষা নিবার ব্যাপার হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। Joyzelle আত্মদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষার মানসে রাত্রিকালে Merlin এর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং Merlinকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার ছুরিকা উত্তোলন করিল। আঘাত করিতে গেলে অদৃশ্য থাকিয়া Arielle তাহা ব্যর্থ করিল। Merlin শয্যাত্যাগ করিয়া Joyzelleকে আলিঙ্গন করিল এবং ঘোষণা করিল যে তাহারই জয় হইয়াছে। Lanceor প্রবেশ করিল—সকল রহস্য প্রকাশিত হইল এবং তাহারা উভয়ে তাহাদের নির্যাতনকারী Merlinকে আলিঙ্গন করিল। Merlin তাহার ক্রুর নিয়তির কাছে আত্মসমর্পন মানসে সে স্থান ত্যাগ করিল।

এই নাটকটিতে মানবজীবনে ভবিতব্যের প্রভাব, আদর্শ প্রেমের দ্বারা মানুষের ভবিষ্যৎ যে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় দেখানো হইয়াছে।

Joyzelle আদর্শ প্রেমের প্রতীক। সে ভালবাসিয়াছে এবং সেই জন্যই প্রেমাস্পদের সকল অপরাধ সে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে—সকল নির্যাতন নীরবে সহ্য করিয়াছে। প্রেমের জন্য চরম সত্য বা চরম মিথ্যা কোন কথা বলিতেই সে দ্বিধা করে নাই। ধরণীর ধূলির সন্তান মানুষ কত দুর্ব্বল কত অসহায়! নিয়ত সে পাপের মধ্যে, মিথ্যার মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে তবু সে ক্ষমার্হ। Lanceor মানব চরিত্রের প্রতীক। পাপ করিয়াও সে ক্ষমা লাভ করিয়াছে কারণ তাহার জড়দেহ পাপ করিয়াছে বটে তবে ইহা তাহার আত্মাকে স্পর্শ করে নাই। শেলীর জুপিটারের মত মহাশক্তিশালী হইয়াও Merlin একটি বিরাট অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক। Arielle Merlin-এর মানস-কন্যা —তাহার প্রতিভার প্রতীক। Arielle এর প্রলোভনে পড়িয়া Lanceor-এর আত্মসমর্পনের ভিতর দিয়া নাট্যকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন—Men

always fall into traps when their instinct leads them, their Frailties being necessary for the designs of life. Merlin এর কাছে আত্মদান করিয়া Joyzelle Lanceorকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। Merlin Lanceor এর কাছে একথা গোপন রাখিতে বলিলে সে অস্বীকার করিয়া বলিল—But I should have to tell him, because I love him (moral again—love cannot lie). Joyzelleর প্রতি Merlin এর যে প্রেম তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া Jethro Bithell বলিয়াছেন—As to his own love for the girl, he bids Arielle kiss her; it seems to her then that flowers she cannot gather are touching her brow and caressing her lips, and Merlin tells her not to brush them aside, they are sad and pure—a symbolisation perhaps of intellectual love which renounces sensuality.

BLUE BIRD

এই বিখ্যাত নাটকটি প্রথমে মস্কোতে ১৯০৮ সালে অভিনীত হয়। Christmas Eveএ রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া কাঠুরিয়ার শিশু-পুত্র-কন্যা Tyltyl এবং Mytyl স্বপ্ন দেখিতেছে—এই স্বপ্ন-কাহিনীর উপরই নাটকটি গড়িয়া উঠিয়াছে। Tyltyl এবং Mytyl যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পাশের বড় বাড়ীতে যে আনন্দোৎসব হইতেছে তাহা দূর হইতে দেখিয়া নিজেরাও আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এমন সময় তাহাদের কুটিরদ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল এবং একটি বৃদ্ধা কুব্জা রমণী প্রবেশ করিল—ইহাকে দেখিতে তাহাদের প্রতিবেশিনী Madame Berlingot এর মত। এই বৃদ্ধা একজন পরী, ইহার নাম

Berylune. ইহার অসুস্থা কন্যা Blue Bird আনিয়া দিবার জন্য আবদার ধরিয়াছে—Tyltyl ও Mytyl কে এই নীল পাখী খুঁজিয়া দিতে হইবে। পরী Tyltyl কে সবুজ টুপি ও যাদুর হীরক দিয়া বলিল—এই হীরাকে একবার ঘুরাইলে সকল বস্তুর সত্যকার অন্তর্নিহিত স্বরূপ দেখিতে পাইবে; দুইবার ঘুরাইলে সমস্ত অতীত তোমার চোখের কাছে স্পষ্ট হইবে এবং তিনবার ঘুরাইলে বর্ত্তমান তোমার সামনে প্রতিভাত হইবে। Tyltyl হীরকটি ঘুরাইবামাত্র বৃদ্ধা পরী সুন্দরী রাজকুমারীতে পরিণত হইল এবং অন্যান্য বস্তুসকল যেন স্বর্গীয় বিভামণ্ডিত হইয়া উঠিল। তাহাদের ঠাকুরদার ঘড়ির হুক্ হইতে ঘণ্টাগুলি বাহির হইয়া আসিয়া সংগীতের তালে তালে নৃত্য সুরু করিল। রুটির আত্মা, আগুন, কুকুর ও বিড়ালের আত্মাগুলি দেখা দিল। কুকুরের আত্মা এই মুক্তিতে বেশ খুশী, কিন্তু বিড়াল সন্দিগ্ধ। জলের কল হইতে জলের আত্মা বাহিরে আসিয়াই আগুনের সঙ্গে লড়াই সুরু করিল। দুধ, চিনি এবং আঁলোর আত্মাও আবির্ভূত হইল। পরীর প্রাসাদে গিয়া সকলে নানারকমের পোষাক গ্রহণ করিল। বিড়ালের ভিতর একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা গেল। কুকুর এবং আলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, এই মনোভাব ব্যক্ত করিল এবং আলোই এই দলের পথ-প্রদর্শকের পদ নিল। প্রথমে তাহারা স্মৃতির দেশে বা the Land of Memory তে গেল। এখানে Granny a ও Gaffer Tyl এর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারা বলিলেন, যখনি তোমাদের মত প্রিয়জনেরা আমাদের মত মৃতজনকে স্মরণ কর, আমরা জাগিয়া উঠিয়া তোমাদের দেখিতে পাই। Tyltyl লক্ষ্য করিল যে এখানে খাঁচায় একটি নীল পাখী আছে এবং Gaffer Tyl ওই পাখীটি তাহাদের উপহার দিতে সম্মত হইল। তাহাদের মৃত ভাই বোনেরা উপস্থিত হইল এবং সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণ খেলা করিয়া কাটাইল। ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি

শুনিয়া তাহারা খাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বিদায়কালে নীলপাখীটি উপহার পাইয়া তাহারা যাত্রা সুরু করিল। স্মৃতির দেশ ছাড়িবামাত্র পাখীটির রং বদলাইয়া কাল হইয়া গেল। [It was not real, it was a dream, and could not bear the light of reality—Jethro Bithell] রাত্রির রাজপ্রাসাদে নীলপাখী পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া Tyltylদের দলটি সেদিকে যাত্রা সুরু করিল। বিড়াল আগে গিয়া রাত্রিকে সাবধান করিয়া দিল যেন ইহারা নীলপাখী না পায়। এখানে তাহাদের দেখা হইল Night, Sleep ও Deathএর সঙ্গে এবং গুহাগুলিতে দেখিতে পাইল The Ghosts, The Sicknesses, The Wars, The Shades and Terrors, Silence and The Mysteries, The Stars, Perfumes of Night, Will-o'-th'-Wisps, Fireflies, Transparent Dew, এবং অবশেষে A Dreamland With Many Blue Birds। এখান হইতে তাহারা কতকগুলি নীলপাখী সঙ্গে নিল কিন্তু Light এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাখীগুলি মরিয়া গেল। সুতরাং পাখীগুলিকে ফেলিয়া দিতে হইল। অরণ্যে প্রবেশের পূর্ব্বেও বিড়াল আসিয়া গাছেদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিল। বিড়ালের প্ররোচনায় Tyltyl হীরকটি একবার ঘুড়াইল—গাছেদের এবং বন্যপশুদের আত্মাগুলি বাহির হইয়া আসিল। বিড়ালের উপদেশে Tyltyl, Joy-লতাকে প্রভুভক্ত কুকুরকে বাঁধিয়া রাখিতে আদেশ দিল। গাছগুলি নিজেরা Tyltylদের আক্রমণ করিতে ভয় পাইল কিন্তু পশুদের আত্মাগুলি তাহাদের মারিতে আসিল। এই যুদ্ধে কুকুর এবং আলোক মানুষের সহায়তা করিল। Light এর উপদেশে হীরকটি আবার ঘুড়াইবামাত্র গাছেদের আত্মাগুলি স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। Light তখন Tyltylকে বলিল—'You see, Man is alone against all in this world".

এরপর তাহারা Palace of Happinessএ গেল। এখানে Luxuries দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহাদের মধ্যে the Luxury of Being Rich, the Luxury of Being a Landowner, the Luxury of Knowing Nothing, the Luxury of Understanding Nothing প্রভৃতির সহিত পরিচয় হইল। এখানকার খাদ্যের লোভে Tyl, Sugar ও Bread প্রলুব্ধ হইল। একটি Luxury গিয়া Lightকে কোমরে ধরিয়া পাকড়াও করিল। হীরকটি ঘুরাইয়া ইহাদের স্তব্ধ করিতে হইল। তার পর আসিল Happiness এর দল—Children's Happiness, Happiness of Tyltyl's own home, the Happiness of Being well, the Happiness of Pure Air, the Happiness of Loving one's Parents, the Happiness of Running Barefoot in the Dew, প্রভৃতি। নীলপাখী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে ইহারা অট্টহাসি আরম্ভ করিয়া দিল। নীলপাখী সম্বন্ধে Tyltyl এর এই অজ্ঞতা ইহাদের প্রচুর হাসির খোরাক জোগাইল। ইহাদের আগমনের খবর পাইয়া Great Joys-এর দল ও আসিয়া উপস্থিত হইল। The Joy of Being Just, the Joy of Being Good, The Joy of Fame, the Joy of Understanding প্রভৃতি। The Joy of Lovingও আসিল, আরও আসিল "The Peerless Joy of Maternal Love"—ইঁহার মধ্যে Tyltyl নিজের মাতার চেহারার সাদৃশ্য দেখিতে পাইল, যদিও ইনি তার নিজের মায়ের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। তিনি Tyltyl কে বলিলেন—"Heaven is wherever you and I kiss each other." এখানেও কিন্তু নীলপাখী পাওয়া গেল না।—

এরপর Light ঘোষণা করিল যে Fairy Berylune খবর পাঠাইয়াছে যে খুব সম্ভবতঃ কবর-খানায় নীলপাখী একজন মৃতের

কাছে লুক্কায়িত রহিয়াছে। Light এর উপদেশে Tyltyl ও Mytyl একাকী কবর-খানায় প্রবেশ করিল এবং হীরক খণ্ড ঘুরাইবামাত্র the gaping tombs give forth an efflorescence which makes a fairy-like garden, with dew on the flowers, murmuring wind and bees and birds : "There are no dead," is the discovery .

[Edward Thomas]

এস্থান হইতে Light এই শিশুদের লইয়া ভবিষ্যতের রাজ্য বা Kingdom of Future এ লইয়া গেল। সেখানে শিশুরা জন্মগ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কেহ খেলা করিতেছে, কেহ কথাবার্ত্তায় মত্ত, কেহ স্বপ্নমগ্ন, কেহ ভবিষ্যতে পৃথিবীতে গিয়া কি আবিষ্কার করিবে সেই কার্যে ব্যস্ত। এই শিশুর দলে একজন রহিয়াছে যে ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুক হইতে সকল অন্যায় দূর করিবে। আর একজন শিশু দেখা গেল যে ভবিষ্যতে Tyltyl এর ভাই হইয়া জন্ম নিবে। বৃহৎ দ্বার খুলিয়া Time প্রবেশ করিল এবং তখন যাহাদের জন্ম নিতে হইবে তাহাদের আহ্বান করিল। দুইটি প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে একজনকে চলিয়া যাইতে হইল এবং অনিচ্ছাসত্বেও তাহার সাথীকে পিছনে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য করা হইল। দূর পৃথিবী হইতে সন্তান-সম্ভবা জননীদিগের আনন্দ সংগীত ভাসিয়া আসিল। এমন সময় Time, Tyltylদের দেখিতে পাইল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সুরু করিল। ইহারা নিঃশব্দে পলায়ন করিল। Light পোষাকের ভিতর নীল পাখীকে সংগ্রহ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

নিজেদের গৃহ সংলগ্ন প্রাচীরের কাছে আসিয়া Light প্রভৃতির কাছে বিদায় নিয়া Tyltyl ও Mytyl গৃহপ্রবেশ করিল। কিন্তু তখনও তাহারা নীল-পাখী সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

ভবিষ্যতের রাজ্য হইতে Light যে নীলপাখী আনিয়াছিল তাহাও পরে pink হইয়া গিয়াছিল। ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায় প্রথম অঙ্কের মতনই Tyltyl এবং Mytyl নিজেদের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা স্বপ্ন। Mummy Tyl আসিয়া ইহাদের জাগ্রত করিলেন। কিন্তু Tyltyl এবং Mytyl তাহাদের নীলপাখী, সংগ্রহের কাহিনী সম্বন্ধে যে সব অদ্ভুত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল তাহাতে Mummy Tyl ভীতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে তাঁহার সন্তানেরা আর বেশী দিন বাঁচিবেনা। কিন্তু Daddy Tyl তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে ভয়ের কোন কারণ নাই। এমন সময় দরজায় করাঘাত শুনা গেল এবং তাঁহাদের প্রতিবেশিনী Berlingot প্রবেশ করিল। শিশুরা ইহাকে Fairy Berylune ভাবিতে লাগিল।

Berlingot এর রুগ্না কন্যা আব্দার ধরিয়াছে যে Tyltyl এর যে পাখীটা আছে তাহা তাহাকে দিতে হইবে। পাখীটির প্রতি নজর পড়িতেই Tyltyl আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে। ইহাই নীলপাখী। Tyltyl পাখীটি দিয়া দিল এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রতিবেশিনী Berlingot এর সঙ্গে তার সদ্যরোগমুক্তা কন্যা পাখীটিকে লইয়া Tyltylকে ধন্যবাদ দিতে আসিল। Tyltyl যখন পাখীটি লইয়া আদর করিতেছিল হঠাৎ পাখীটি উড়িয়া গেল। প্রতিবেশিনীর কন্যা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। Tyltyl সান্ত্বনা দিয়া বলিল যে আবার উহাকে ধরিয়া দিবে। এরপর দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া Tyltyl বলিল—"If any of you should find him, would you be very kind as to give him back to us ?—We need him for our happiness later on"

এই নাটকটিতে পশুজগৎ ও জড়জগৎকে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট এবং প্রাণবন্ত করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে মানুষের সঙ্গে ইহাদের সত্যকার

সম্বন্ধের দিকটা নাট্যকার ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে প্রেমিক প্রেমিকার বিরহের অবতারণায় নাট্যকার বোধ হয় এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে পরম মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদকে বাদ দিয়া দেখা যায় না। বিচ্ছেদ যেন আমাদের ভবিতব্যের মতো। ইহা নিয়ম বহির্ভূত ব্যপার নহে—ইহাই স্বাভাবিক চিরন্তন সত্য। বনের যুদ্ধের ব্যপারে গাছপালা এবং পশুদের মানুষের উপর রাগের কারণ Oak গাছের ভাষায় এইরূপ—"This is the first time that it is given to us to judge Man and make him feel our power........I do not think that, after the harm which he has done us, after the monstrous injustice which we have suffered, there can remain the least doubt as to the sentence that awaits him"

আশ্চর্য্য এই পৃথিবী আর তার থেকেও বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত জীব এই মানুষ। বিরাট বস্তুজগৎ এবং পশুজগৎ তাহার উপর ক্রুদ্ধ কারণ এই সকল বিরাটকে মাথা নত করিতে হইয়াছে ক্ষুদ্র মানুষের কাছে। এই দৃশ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিই সঙ্কেত করা হইয়াছে। শুধু এ দৃশ্যেই নয় রাত্রি-রাজ-পুরীতেও রাত্রি স্বীকার করিতেছে যে—"Man has captured a third of her mysteries, that all her terrors are afraid, her ghosts fled and most of her sicknesses ill.... ......must he absolutely know everything."

ভবিষ্যতের রাজ্যেও এ সত্যকে জোর দিয়া বলা হইয়াছে। ভবিষ্যতের যন্ত্র প্রাধান্যের দিকটাকেও ফলাও করা হইয়াছে। ভবিষ্যতের মানুষ যে অতিমানুষ হইবে তাহাও ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। ভবিষ্যতের রাজধানীতে দেখা যায়—Gliding about among the children are taller figures, "clad in a paler and more diaphanous azure,

figures of a sovereign and silent beauty"—the race which shall inhabit the earth when man has made way for his offspring the Superman.

কবরখানাতে Tyltyl এর "There are no dead" কথার ভিতর দিয়া আত্মার অমরত্বের কথাই বুঝাইতেছে। নীলপাখীকে আনন্দের প্রতীক এবং নীলপাখীর জন্য এই অন্বেষণ যাত্রাকে মানুষের আনন্দ আবিষ্কারের প্রচেষ্টার প্রতীক হিসাবে ধরা হইয়া থাকে।—

পরিশেষে এই নাটকটি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার। সাঙ্কেতিক নাটক হিসাবে সকলেই প্রায় একযোগে ইহার নাম করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মতবাদ ঠিক মানিয়া লওয়া যায় না। সঙ্কেত (symbol) অপেক্ষা ইহাতে রূপকের প্রাধান্য বেশী। The Blue Bird নাটকে Materlinck অত্যন্ত বেশী স্পষ্টভাবে আত্মসচেতন। সঙ্কেত-সাহিত্য রচয়িতার কল্পনাশক্তি একটা বিশেষ ভাবের ভিতর দিয়াই শিল্পসৃষ্টি করিয়া থাকে। শিল্পীর সচেতন মন বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অবচেতন অথবা অধিচেতন মনটা কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়া সকল কিছুর অন্তরতম সত্যকে আবিষ্কার করিয়া সঙ্কেতের ভিতর দিয়া তাহার রূপ দিতে প্রয়াস পায়। সচেতন মন লইয়া আধ্যাত্মিক সত্যের দর্শন বা উপলব্ধি হয় না। আবার সঙ্কেতের সহিত আধ্যাত্মিকতা অতি নিবিড়ভাবে যুক্ত। সুতরাং সচেতন মনে সঙ্কেত সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে না। তাছাড়া, এ নাটকটি এত প্রাণবন্ত এবং জীবন্ত যে ইহাকে ঠিক রূপক বা allegory ও বলা চলে না। নাটকটির প্রধান এবং সঠিক পরিচয় Fairy play হিসাবে। ইহা হইতে তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক সত্য যতটা না পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যায় সহজ আমোদ এবং আনন্দ।

নাটকটিতে ভাবিবার অপেক্ষা দেখিবার বস্তুই আছে বেশী। বক্তব্যকে আভাস, ইশারায় না বলিয়া বেশীর ভাগ সময়ই অতি স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। এই সব কারণেই ইহাকে সাঙ্কেতিক বা রূপক নাট্য না বলিয়া Fairy play বলাই বোধ হয় বিধেয়।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ

জগতের শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাট্যকারগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই তাঁহার নাম করা সাঙ্কেতিক নাট্যগুলি সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং যথেষ্ট প্রশংসাও অর্জ্জন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আমাদের দেশের সাহিত্যে যে পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাট্য রচিত হয় নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সংস্কৃতে অবশ্য রূপকনাট্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং এই ধরণের নাটকের টেক্‌নিক লইয়া নাট্যকারগণ নানাধরণের পরীক্ষাও চালাইয়াছিলেন। এবিষয়ে ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন—"প্রবোধচন্দ্রোদয় রূপকনাটক। বিবেক, মোহ, প্রবৃত্তি, শম, দম, ক্ষমা, মানস, সঙ্কল্প, মুদিতা, ধর্ম্ম বৈরাগ্য, তৃষ্ণা, দম্ভ, বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধা, মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি নাটকের চরিত্র।

সাহিত্য-দর্পন—(উড়িষ্যার পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক একাদশ শতাব্দীতে লিখিত) নাটককে প্রধান দুইভাগে ভাগ করেছে; (১) রূপক ও (২) উপ-রূপক। আবার রূপকের দশ ও উপ-রূপকের আঠারো রকমের বিভিন্ন বিভাগ স্বীকৃত হয়েছে।" তবে পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাট্য সংস্কৃত-সাহিত্যে ছিল বলিয়া মনে হয় না। যদি থাকিয়া থাকে তবে সংস্কৃত-সাহিত্যের পণ্ডিতগণ এবিষয়ে কিছু আলোচনা প্রকাশ করিলে অনেক সাহিত্যানুরাগীই যথেষ্ট উপকৃত বোধ করিবেন।

নাটকের ক্ষেত্রে সাঙ্কেতিক শিল্প কৌশল বিকাশলাভ না করিলেও ভাব প্রকাশের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সভ্যতার আদিযুগ হইতে সাঙ্কেতিকতা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

ঈশ্বর উপাসনায় আমাদের পৌত্তলিক-প্রথাকে অনেক সময়েই ভিন্ন দেশীয়েরা না বুঝিয়া নানাপ্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পিছনে যে গভীর সাঙ্কেতিক অর্থ আছে তাহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে কি করিয়া! নিরাকার ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধি করা তো সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। এইজন্যই আমরা প্রতীকের সাহায্যে সেই অনাদি অনন্ত অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক শক্তিকে মনে প্রাণে অনুভব করিতে চেষ্টা করি। নিরাকারবাদীর দলের মজা হইল এই যে, আপাত দৃষ্টিতে তাঁহারা অপৌত্তলিক কিন্তু কার্য্যত তাঁহারাও কম পৌত্তলিক নহেন। কৃশ্চিয়ানদের কাছে ভগবান পুত্র সাকার ক্রাইষ্ট যতটা জীবন্ত, মূর্ত্ত এবং শ্রদ্ধেয়, স্বয়ং নিরাকার ভগবান ঠিক ততটাই প্রতিভাত এবং অনুভূত কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অপৌত্তলিক মুসলমানদের বেলায় ক্রাইষ্টের স্থান অধিকার করিয়াছে মহম্মদ। আমাদের বহু দেবদেবী লইয়াও মুসলমানেরা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। ইহারা যে একেশ্বরেরই অমিত শক্তির বিচিত্ররূপের নানাধরণের প্রতীক এ সহজ কথাটা এ সকল লোকেরা কেন যে বুঝিতে পারে না তাহা বলা মুস্কিল। চিন্তার রাজ্যে অতি উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল বলিয়াই হিন্দুরা বুঝিতে শিখিয়াছিল ঈশ্বর অদ্বৈত এবং অসীম—কিন্তু সেই অসীম পরমব্রহ্মই আবার সীমার মধ্য দিয়া নিজেকে নানাভাবে নানাদিকে নানারূপে প্রকাশিত, বিকশিত এবং রূপায়িত করিয়াছেন। সীমার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ না করিলে অসীমকে ধারণার মধ্যে আনা সম্ভব হয় না। আবার সীমা কখনও অসীমকে পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করিতে বা ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। অসীম ক্রমাগত সীমার মধ্যে রূপায়িত হইতেছে এবং আবার তৎক্ষণাৎ সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। সীমা অসীমেরই প্রতীক। সাকার নিরাকারেরই সাঙ্কেতিক মাধ্যম।

সংস্কৃত সাহিত্য এবং দর্শনের পাতায় পাতায় এ সকলের আলোচনা আছে। স্থাপত্য এবং কলাশিল্পের নানা ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সঙ্কেতের ব্যবহার করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে E. B. Havell-এর Indian Architecture বই হইতে কিছুটা তুলিয়া দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—"What a mihrab was to the Musulman, the lotus was to the Buddhist and Hindu. The shining lotus flowers floating on the still dark surface of the lake, their manifold petals opening as the sun's rays touched them at break of day, and closing again at sunset, the roots hidden in the mud beneath, seemed perfect symbols of creation, of divine purity and beauty, of the cosmos evolved from the dark void of chaos and sustained in equilibrium by the cosmic ether, akasha. Their colours, red, white and blue (The lotus in Hindu ritual must be taken to include water-lily as well as the sacred lotus of Egypt), were emblems of the Trimurti, the three Aspects of the One—red for Bramha, the Creator; white for Shiva, the Divine Spirit, blue for Vishnu, the Preserver and Upholder of the Universe. The bell-shaped fruit was the mystic Hyranyagarbha, the womb of the Universe, holding the germ of worlds innumerable still unborn. The lotus was the seat and footstool of the Gods, the symbol of the material universe and of the heavenly spheres above it. It was the symbol for all Hinduism, as the mihrab was for all Islam.

Closely connected with the symbolism of the lotus was that of the water-pot—the Kalasha or Kumbhu—which held the creative element, or the nectar of immortality churned by Gods and demons from the cosmic ocean ....The open lotus flower is used as a sun-emblem on the Buddhist rails of Bahrut, Sanchi, and Amaravati ; the so called "horse shoe" arch of early Buddhists gables and windows, derived from bent bambu, suggested the lotus leaf ; Buddhist and Hindu domes, constructively derived from the bambu also were made to imitate the bell-shaped lotus fruit and sculptured with the petals of the flower. The combination of the lotus flower, the bell-shaped fruit and the water-pot forms the basis of the design of most Hindu temple pillars, the prototypes of which were doubtless the carved wooden posts marking the sacrificial area, in the ancient vedic rites, to which the victims were bound.

আমাদের দেশের মনীষীগণ আকাশে বাতাসে জলে স্থলে নভোমণ্ডলে সর্ব্বত্র সাঙ্কেতিকতার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন সেই কোন আদিকাল হইতে। এইজন্যই তাঁহারা বলিতে পারিয়াছেন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—জগতের বাহ্যিক রূপটা একটা বিরাট মায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সকলের মূলে রহিয়াছে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অতীত এক অতীন্দ্রিয় বিরাট শক্তি। বাস্তব জগতের বাস্তব-রূপটার যে কোন অর্থই নাই, যতক্ষণ না ভাবব্যঞ্জনায় এই বাস্তবকে ব্যাপিয়া

যে মহাশক্তি আছে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, এই আধ্যাত্মিক সত্য বুঝাইতে গিয়া আর্য্যঋষি উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করিয়াছেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছু অনিত্য বস্তুকেই আবৃত করিয়া রহিয়াছেন পরমেশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে ধরিয়া আত্মাকে বিকশিত করিয়া তোলো। বাস্তবতা বিসর্জ্জন দাও—বাস্তবের নিজস্ব কোন সত্তা নাই—সুতরাং সে কাহারও আয়ত্তে আসিতে পারে না। সমস্ত জগৎকেই এখানে এক বিরাট প্রতীক হিসাবে ধরা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের যুগগুরু। তাঁহার পুর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় সাধকগণ সকল রূপের ভাব ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া যে অপরূপ অরূপের আভাসকে অনুভব করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন কবিও তাঁহার সকল সৃষ্টির মধ্যেই সেই অতীন্দ্রিয়কে সঙ্কেতের সাহায্যে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গুহাহিতকে আলোক-সম্পাতে নির্দ্দেশিত করিতে চাহিয়াছেন। অসাড়ের বুকে সাড়া আনিয়া তাহাকে জাগ্রত এবং প্রাণবন্ত করিয়াছেন। অব্যক্তকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অরূপকে রূপ দিয়াছেন, মৌনকে নীরব-মুখর করিয়া তুলিয়াছেন, বাণীহীনকে বাণী দিয়াছেন এবং যাহার প্রকাশ নাই তাহাকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ভাবধর্ম্মী। এই জন্যই তাঁহার সৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। রসঘন ভাবের প্রকাশ সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই রূপ নেয়। এইজন্যই তাঁহার উপন্যাসগুলি ও গদ্য কাব্য এবং প্রবন্ধগুলিও যেন কাব্য-সঙ্গীত হইয়া দাঁড়ায়। এই তীব্র ভাবানুভূতিই কবিকে শব্দ, গন্ধ স্পর্শের জগৎকে ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয়তার দিকে

টানিয়া লইয়া গিয়াছে—বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া অতিবাস্তবের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। অতীন্দ্রিয় অতিবাস্তব আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে সহজ এবং সাধারণ ভাবে বলা যায় না—বলিতে হয় আভাসে ইঙ্গিতে ইশারায়! এইজন্যই তাঁহাকে সাহিত্যের নানাক্ষেত্রেই সঙ্কেতের ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এই সঙ্কেতগুলিই হইয়াছে তাঁহার ভাবের বাহন। নাটকগুলিতে জমকালো প্লট বলিতে যাহা বুঝায় তেমন কিছুই নাই—প্রতীক-নাট্যে অবশ্য প্লট জমকালো হইবার অবকাশও কম। এক একটি নাট্য যেন স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত এক একটি সঙ্গীত। চরিত্রগুলি সহজ, সরল অনাড়ম্বর—যেন একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতের তাল, লয়, সুর, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি। পরিবেশের মধ্যেও কোনও জটিলতা নাই। এক কথায় সকলই অতি সহজ এবং সরল।

শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, দৃষ্টিভঙ্গী মনের স্বাভাবিক গঠন প্রভৃতি সকল দিকদিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন গড়িয়া উঠিয়াছিলেন সাঙ্কেতিক শিল্প সৃষ্টি করিবেন বলিয়া। স্বভাবতই তিনি ছিলেন ভাবগম্ভীর এবং চিন্তাশীল। পিতা মহর্ষির সহিত বহুদিন হিমালয়ের বুকে এবং প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন এবং ঔপনিষদিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ধ্যানের মহিমা তাঁহার কাছে অজানা ছিল না—অজানা ছিল না নীরবতার মুখর বীণার সুরঝঙ্কার। সকল বস্তুর মর্ম্মের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা অতি সহজ ভাবেই তিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। জীবনের শেষ বয়স অবধি নিশাবসানের প্রারম্ভে কিছু সময় অবধি তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। ধ্যানলব্ধ অনুভূতিই সকল কিছুর আধ্যাত্মিক পরিচয়কে তাঁহার কাছে সহজ ভাবে প্রতিভাত করিত। এইজন্যই সাঙ্কেতিক নাট্যগুলি তাঁহার কাছে এত Concrete ছিল। এইজন্যই "রক্তকরবীর" প্রস্তাবনায় তিনি বলিয়াছেন "এইটি মনে রাখুন,

রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ।......সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে সে দায় কবির নয়।"

রবীন্দ্রনাথ ও মেটারলিঙ্কের প্রতীক নাট্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে মেটারলিঙ্ক নাটকের বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার নাট্যে প্রাসাদ, টাওয়ার, নদী, বনানী ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায় এবং এগুলি সকলই সাঙ্কেতিকতার যাদুতে ভরা। রবীন্দ্রনাথের নাট্যে ভাবের বিকাশের দিকেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে—অস্বাভাবিকতা বা ভয়সঞ্চার করিতে পারে এমন কিছুই তিনি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার রচনায় যাদুর খেলা নাই বলিলেই চলে। মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ প্রভৃতির লেখায় অবচেতন মনেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এজন্য তাঁহাদের সকল রচনাই যেন স্বপ্নালু, মায়াময়, অস্বাভাবিক এবং সময় সময় একটু morbidও লাগে। পড়িতে পড়িতে শরীর মন যেন আলস্যে ভরিয়া আসে। চারিদিকে একটা তন্দ্রালুভাব বিরাজ করিতে থাকে—মনের মধ্যে একটা অসুস্থ হতাশার ভাবের উদ্রেক হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় অধিচেতন মনেরই সমধিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই তাঁহার লেখা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মন শিশির ভেজা ঘাসের মত সতেজ, সুস্থ ও রসময় হইয়া উঠে। এদিক দিয়া বিচার করিলে তিনি এবং জার্মান নাট্যকার হাউপট্‌মান্ এক জাতীয় প্রতীক-শিল্পী এবং ইয়েটস্, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি একটু অন্যজাতের। রবীন্দ্রনাথ এবং হাউপট্‌মানের নাটকের সাধারণ আখ্যানভাগের দিক্‌টাও অসুন্দর বা একঘেয়ে নয়। গভীর অর্থের

দিক্‌টাই প্রধান কিন্তু বাচ্যার্থের দিকটাও মনকে টানে এবং হেলায় অগ্রাহ্য করিবার মত নয়। অন্যদলের বেলায় বাচ্যার্থের দিকের নিজস্ব এমন কোন সৌন্দর্য্য বা গুণ নাই যাহা পাঠকের মনে ছাপ রাখিতে পারে—এজন্যই বোধহয় ওদেশের একদল সমালোচক এসকল নাট্যকারের নাটককে no-plot plays নাম দিয়াছেন।

শারদোৎসব (১৩১৫)

প্রকৃতির বুকে স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া ওঠা ফুলে ফলে লতায় পাতায় সজ্জিত কাননের ন্যায় এ নাটকটিও গড়িয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির আলো বাতাসের মাঝে। মাঝে মাঝে রহিয়াছে অপূর্ব্ব সংগীত-ঝঙ্কার। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে Edward Thompson লিখিয়াছেন—

"Its stage is as simple as Chitrangada's, being just the open air, where wind and sunlight are almost actors, and are certainly the pervading life. Autumn-Festival like Phalguni later, is almost a mask, in the sense of the word as Milton left it. There is no dancing, though the wild gusty bands of revellers who from now on are a constant feature of his plays, sweeping in, nature-intoxicated, with songs whose theme is their utter irresponsibility, dance in everything but name. Say, then, if you like, that there is no dancing, which makes a slight difference from the class of Comus; but there is an abundance of

pastoral accompaniment, of happy atmosphere, of freshness of phrase and feeling."

ইহা গদ্যে লিখিত কাব্য। পরিবেশের সর্ব্বত্র এই কাব্যভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চরিত্রগুলির মধ্যে রহিয়াছে সন্ন্যাসীবেশী চক্রবর্ত্তী সম্রাট, রাজা, কৃপণ লক্ষেশ্বর, বালক উপনন্দ, জ্ঞানীবৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ও বালকের দল। সম্রাট এবং রাজা দুইজনেই বিদ্রোহী —কিন্তু কি বিভিন্ন ধরণের বিদ্রোহ এই উভয়ের। রাজা শক্তির উপাসক—তাঁহার বিদ্রোহ ন্যায়ের বিরুদ্ধে, জ্ঞানের এবং বুদ্ধির অনুমোদিত পন্থার বিরুদ্ধে। আর সম্রাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন বাস্তব জীবনের বন্ধনাদির বিরুদ্ধে কুপ্রথার এবং কুসংস্কার ধ্বংসের মানসে। ঠাকুরদাদা জ্ঞানের প্রতীক—ইহা সেই ধরণের জ্ঞান যাহা প্রকৃতির বুক হইতেই আহরণ করা যায়। যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে ইংরাজ কবি Wordsworth মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং এই জ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্য্যের মাধুরীর দ্বারা ইংরাজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। উপনন্দ অপরিণত কিন্তু অতিশয় উদার।

সমস্ত নাটকটি ব্যাপিয়া উৎসবের আনন্দ। এ আনন্দকে আরও গভীর আরও মহৎ আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে উপনন্দের জীবনের ব্যথাভরা কাহিনীর দিকটা। সকলে উৎসবের আনন্দে মত্ত আর এই বালকটী প্রভুর ঋণ শোধের জন্য পুঁথি নকলে রত। কি চরিত্রের ঔদার্য্যে কি কর্ত্তব্যবোধের দিক দিয়া, বালকটি যেন এই শারদোৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। নাটকটি পড়িতে পড়িতে Shakespeare এর As you like it নাটকের Forest of Arden এর দৃশ্যগুলির কথা মনে হয়।

এইবার নাটকটি সম্বন্ধে কবি নানাস্থানে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

"সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে ফলে হাওয়ায় আলোকে আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়।"

* * * *

"মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।"

* * * *

"মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরও অনেক বড়ো হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার করা কখনোই নিষ্ফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র তখন তাহা না থাকারই সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ-অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি; চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজনশক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে; সেই হৃদয়ে যদি কোন রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে। লক্ষেশ্বর—সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সকলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্ষা করিয়া, সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে। সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জ্জন দেয় বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া, সুন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।

কিন্তু এই যে সুন্দরকে খুঁজিবার কথা বলা হইল, সে কী। সে কোথায়। সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটা শৌখিন পদার্থ। এই কথারই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রহিয়াছে।

শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে। রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ-পরিশোধের এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে ক্ষেত ভরিয়া

উঠিল শঙ্খের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেইটাকে বাহিরে নানারূপে নানারসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।

দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নাই। সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যার অকৃপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ করিতে থাকে তখনই দেবতা তাহার মধ্য হইতে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকে নূতন আকারে ফিরিয়া পান, আর তখনই কি তাহার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটাইয়া উঠিতে থাকে ততই কি তাহা সুন্দর, তাহা উজ্জ্বল হয় না। বাধা কোথায় কাটে না। যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবতা হইয়া উঠিতে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায় সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের ঋণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়িয়া থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় বলিয়া মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগাইয়া একেবারে ফুঁকিয়া দিতে চায়; তাহাকে যে অমৃত দেওয়া হইয়াছিল, যে অমৃতের উপলব্ধিতে সে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দুঃখকে গলার হার করিয়া লয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়া সেই অমৃতকে তখন সে শোধ করিয়া দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য; আনন্দরূপমমৃতম্।

রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, এই ঋণ শোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়,—কর্মকে

এড়াইয়া তপস্যায় ফাঁকি দিয়া পরিত্রাণ লাভ হয়না। তাই তিনি উপনন্দকে বলিয়াছেন, "তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।"

* * * *

"লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্যা করিয়া শিবকে পাইয়াছিলেন, মর্তলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সহিত মিলন লাভ করেন। যে মানুষ বা যে জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই তপস্যা নাই, দুঃখস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নাই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয়না।

উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণ-শোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।"

শারদোৎসবের "ভিতরকার ধুয়ো" সম্বন্ধে "আমার ধর্ম্ম" প্রবন্ধে কবি লিখিয়াছেন:

"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ ক'রে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব ক'রতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেননা ওই ছেলেটার সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের

যোগ—ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত; অসীমের যে-দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টা দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋাণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জ্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয় কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেই খানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশীর সুর শোনবার কথা নয়।”

পরিত্রাণ

প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিত্রাণ নামে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে। “বৌ ঠাকুরাণীর হাট” উপন্যাস হইতেই এগুলির বিষয় বস্তু লওয়া হইয়াছে। তবে পরিবর্ত্তনে নাটকগুলির রূপ যেন নূতনের মতই হইয়াছে। নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র নূতন সৃষ্টি। এই ধরণের আত্মভোলা উদার নির্ভীক চির নবীন বিজ্ঞ চরিত্র

রবীন্দ্রনাথের নানা নাটকে নানা নামে, যথা—শারদোৎসবের ঠাকুর-দাদা, অচলায়তনে দাদাঠাকুর, রাজাতে ঠাকুরদাদা, এবং সময় সময় এই নামেই—যথা প্রায়শ্চিত্ত এবং মুক্তধারা নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী—আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত পরিবেশের মধ্যে একটা স্বর্গীয় ভাব পরিব্যাপ্ত করিয়াছে—সীমাহীনের সংগীত শুনাইয়া সকলকে মুক্তির আলোক দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছে—বদ্ধ আবহাওয়ার ভিতর হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের স্বাধীনভাবে নিজেদের বিকশিত হইবার শিক্ষা দিয়াছে। নাটকটির যাহা প্রধান বক্তব্য তাহা আরও সুন্দর ভাবে পরে মুক্তধারা নাটকে রূপায়িত হইয়াছে। ধনঞ্জয় চরিত্র সাঙ্কেতিক চরিত্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে নাটকটিতে ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রাধান্য সাঙ্কেতিক রহস্যকে যেন ছাপাইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

ধনঞ্জয় চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"প্রায়শ্চিত্ত নাটকের মধ্যে একটি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে—ধনঞ্জয় বৈরাগী। ইংরেজী ১৯০৮ সালের কাছাকাছি সময়ে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সত্যকথায় অত্যাচারীদের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন। এই সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর জীবনে পরে আরও স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কবির সৃষ্টি এই ধনঞ্জয় বৈরাগী যেন মহাত্মা গান্ধীর ভবিষ্যৎ কর্ম্মঠ পরিণত চরিত্রের সহিত ভাবপ্রবণ কবিবরের স্বকীয় চরিত্রের সংমিশ্রণে গঠিত। যে মহাত্মা পরে অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যায় আইন অমান্য করিয়া জগন্মান্য হইয়াছেন, এবং যে কবি জালিয়ানওলাবাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিজের সম্মানজনক খেতাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দুই মহনীয় চরিত্রের সমাবেশে যেন এই ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র সংগঠিত।

পরে ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই নাটককে আরও কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশ করেন। উহাতেও ধনঞ্জয় চরিত্র আছে। এখানেও রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায় প্রজাদের পক্ষ হইয়া তিনি উদয়াদিত্য রাজকুমার এবং সুরমা বধূ রাজমহিষী বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ও ন্যায়ের নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ কারাবরণ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। এই নাটক দুইখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখা হইলেও ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের আধুনিক কালের রাজনৈতিক অবস্থার ছায়া পড়িয়াছে।

মুক্তধারা নাটকখানিও এই পর্য্যায়ের, তাহাতেও ধনঞ্জয় আছেন। যে-সব ভীরু মূক প্রজারা অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে পারে না, তাহাদের মুখপাত্র ও বাণীমূর্ত্তি এই ধনঞ্জয় বৈরাগী—তিনি বৈরাগী বলিয়া সকলেই তাঁহার আপন এবং ন্যায় ও সত্য তাঁহার ধর্ম্ম।"

রাজা

এই নাটকটি বাংলা ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত রূপ ১৩২৬ সালে "অরূপ রতন" নামে আত্মপ্রকাশ করে। "রাজা" "অচলায়তন" ও "ডাকঘর" এই তিনটি নাটকই "গীতাঞ্জলী" ও "গীতিমাল্যের" সমসাময়িক কালে রচিত। যে অধ্যাত্মরস ও ভাগবতপ্রেমের ব্যাকুলতা কাব্যগুলিকে চরম মর্য্যাদা দিয়া শ্রেষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যের স্তরে উন্নীত করিয়াছে তাহাই নাটকের মাধ্যমে নবরূপে পরিবেশিত হইয়াছে 'রাজা' প্রভৃতিতে।

আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে এমন পরিপূর্ণভাবে নাটকের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিতে কোনো দেশের সাহিত্যেই আর দেখা যায় নাই। ব্লেকের The Marriage of Heaven & Hell বা টম্পসনের The Hound of Heaven প্রভৃতি কাব্যে আধ্যাত্মিকতাকে রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহা প্রচেষ্টার অধিক আর কিছুই নহে—পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের নাটকগুলির সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হইতে পারে না। কি গভীর বিশ্বাস, কি তীব্র অনুভূতি, অথচ তাই বলিয়া বিচারশক্তিহীনতা, বুদ্ধির অভাব বা ইন্দ্রিয়াদির প্রভাবকে অস্বীকার করিবার প্রচেষ্টা কবি করেন নাই। ভাবাবেগে ধর্ম্মান্ধের ন্যায় ঈশ্বরকে উপলব্ধির প্রয়াস এক হিসাবে সহজ পন্থা। কিন্তু এ যেন স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় ভগবানকে জানিবার তীব্র আকাঙ্খা। মানবহৃদয়ের বিভিন্ন দিক লইয়া এক একটি চরিত্র সৃষ্ট। ভক্তি আছে, জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, নাস্তিকতা আছে—এই সকল দিকের কোনোটিকেই কবি উপেক্ষা করেন নাই। আধুনিক যুগের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই এই সকল গুণাবলীর সমষ্টি দেখা যায়। কবি যেন ইঙ্গিতের দ্বারা এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

'কুশ-জাতক'-এর একটি গল্পকে পরিবর্ত্তিত করিয়া 'রাজা'র আখ্যান তৈয়ারী করা হইয়াছে। জাতকের গল্পটি এইরূপ—মল্লরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের দিক দিয়া ছিলেন অসাধারণ, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে রূপ দেন নাই। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মদ্ররাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পাছে কুৎসিত পুত্রকে দিবালোকে দেখিলে পুত্রবধূ ঘৃণা করেন এই ভয়ে কুশের মাতা উভয়কে দিনে সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। প্রভাবতী যখন দিবালোকে স্বামীকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন তখন সুরূপ

দেবরকে দেখাইয়া তাঁহাকে শান্ত করা হইল। কিন্তু পতি-পত্নীর সাক্ষাতে আর বেশীদিন বাধা দেওয়া গেল না এবং কুরূপ স্বামীকে দেখিয়া প্রভাবতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। পরে প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের হাত হইতে শ্বশুরকে উদ্ধার করিয়া কুশ পত্নীপ্রেম লাভ করিলেন।

"রাজা" নাটকের সুরু এক অন্ধকার কক্ষে—রাণী সুদর্শনা ও দাসী সুরঙ্গমার মধ্যে কথোপকথন হইতেছে। নাটকের অদ্ভুত আশ্চর্য্য রাজা এই অন্ধকার ঘরেই রাণীর সহিত মিলিত হইতেন। সুদর্শনা এ অন্ধকার সহ্য করিতে পারিতেছেন না—তিনি চাহেন আলো। দাসী সুরঙ্গমা বলে, অন্ধকারকে না চিন্‌লে আলো-কে চিনবে না। সুদর্শনা মানবাত্মার প্রতীক্; রাজা ঈশ্বর এবং এই জন্যই তিনি অরূপ,—মানুষের বুদ্ধির মাপকাঠিতে বা বিচারশক্তিতে তাঁহার রূপের বর্ণনা করা যায় না। সুরঙ্গমা ভক্তিরসের দ্বারা আপ্লুত এবং রূপায়িত। ভক্তির দ্বারা সে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে—ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার কোনো কৌতূহল নাই, সংশয় নাই, আছে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের ভাব। এইখানে সুদর্শনার সহিত তাহার প্রভেদ। সুদর্শনা চাহে বুদ্ধির দ্বারা রাজাকে জানিতে, সকল কিছু অন্ধকার অপসারিত করিয়া আলোর মধ্যে রাজার সহিত মিলিত হইতে। এ সমস্যা সকল বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরই প্রব্লেম, যাহা বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায় না, তাহাই যেন অবিশ্বাস্য। কিন্তু এই বুদ্ধি-সর্ব্বস্বের দল বুঝিতে পারে না যে ঈশ্বর অনাদি অনন্ত অসীম এবং অরূপ। তিনি বুদ্ধির অগোচর—প্রগাঢ় কল্পনা শক্তির দ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি এবং অনুভব করা যায়। সুদর্শনা রূপের তৃষ্ণায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। পতঙ্গ যেমন আগুনের ভয়ঙ্করী রূপের আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তেমনি মৃন্ময়-রূপের আরাধনায় সুদর্শনা

নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিল। অথচ সুরঙ্গমা কি ধীর, স্থির, শান্ত এবং সমাহিত ; ভক্তির সুধারসে সে আপ্লুত, স্নিগ্ধ এবং মাধুর্য্য-মণ্ডিত। সে যৌবনে নষ্ট হইবার পথে গিয়াছিল—রাজার আশ্রয়ে রক্ষা পাইয়া সে তাঁহার অন্ধকার ঘরের দাসীরূপে প্রতিষ্ঠিতা।

সুদর্শনা রাজাকে চোখে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সে বলিল, যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখী মাটি পাথর সমস্ত দেখ্‌চি সেইখানেই তোমাকে দেখ্‌ব। রাজা সম্মত হইয়া বলিলেন, "আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখ্‌বার চেষ্টা কোরো।"

এর পরের দৃশ্য পথ। একজন বিদেশী পথিক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল কোন্ পথ দিয়া গেলে উৎসবের জায়গায় যাওয়া যাবে। প্রহরী উত্তর দিল—'এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে-দিক্ দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে।' ঈশ্বরের আনন্দোৎসবে যোগ দিতে হইলে কোন বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিবার তো কোন আবশ্যকতা নাই। সব রাস্তা দিয়াই তো তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। 'এদেশে সবই উল্টো —যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও মানা করেনা। তবু এদেশে মানুষও ঢের দেখা যায়।' অর্থাৎ যে যাই বলুক বা করুক শেষ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ লোকই ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখিয়া পারে না। সত্যকার নাস্তিক হইবার মত বুকের পাটা কম লোকেরই থাকে।

এরপর বালকগণকে লইয়া ঠাকুর্দ্দা প্রবেশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের নাটকে অনেক ক্ষেত্রেই ঠাকুর্দ্দা চরিত্রের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় ভিন্ন নামেও —যেমন দা'ঠাকুর বা ধনঞ্জয় বৈরাগীরূপে ইঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। পৃথিবীতে চিরকালই একজাতীয় মহামানব

দেখা যায় ঈশ্বরের স্বরূপ যাঁহাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। বাধা, বিঘ্ন, বিপদ, কোনো কিছুতেই ইঁহারা বিচলিত হন না। অন্ধকারের সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঁহারা সর্ব্বত্রই রাজাকে দেখিতে শিখিয়াছেন। রাজা যে শুধু আনন্দেরই রাজা নহেন, তিনি দুঃখরাতেরও রাজা একথা ঠাকুর্দ্দার অজানা নয়।

এদেশের লোকেরাও কখনও রাজাকে চক্ষে দেখিতে পায়না। অনেকের মনে তাই সন্দেহ যে রাজা হয়তো মোটেই নাই। রাজার অস্তিত্ব ব্যাপারটা একেবারে ভুয়ো। বসন্ত-উৎসবে নানা দেশের রাজা নিমন্ত্রিত—কেবল এই দেশের রাজারই দেখা নাই। সকলের সন্দেহ আরও দৃঢ় হইতে লাগিল, যে রাজা নাই। এমন সময় মেকী রাজা সুবর্ণের আবির্ভাব হইল। 'ননীর পুতুলের মত চেহারা—ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে—ভয় হয় পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।' ঠাকুর্দ্দা কিন্তু ইহাকে রাজা বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন—'কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়। এমন উৎপাত তো কোনদিন করে না।······সে যে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোট ভিক্ষুক বড় ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে ক'রে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে রাস্তার দুইধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে—তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস্।'

আর বিশ্বাস করে না কাঞ্চীর রাজা। তার মনে কোনো সন্দেহই নাই—সে ঘোরতর নাস্তিক এবং বিদ্রোহী। তাহার কাছেও ছদ্মবেশী সুবর্ণর ধাপ্পাবাজী খাটিল না, ফাঁকি ধরা পড়িয়া গেল। আসলের সম্বন্ধে যতই তাহার অবিশ্বাস থাক্, নকলের মিথ্যা তাহার দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হইল না। কাঞ্চীরাজের লোভ রাণী সুদর্শনার উপর—সে স্থির করিল সুবর্ণের সাহায্যে সে রাণীকে আয়ত্ত করিবে।

একদল নাগরিক ঠাকুর্দ্দাকে বলিতে লাগিল—আমাদের রাজা নেই—ফাঁকি দিয়ে আর কতদিন মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে? উত্তরে ঠাকুর্দ্দা বলিলেন—নিজেও ভুলেছি ভাই, কার সঙ্গে ঝগড়া করবে বল? তোমাদের রাজা তো কারো কানে ধরে বলছেন না, 'আমি আছি'—তিনি তো বলেন, তোমরাই আছ, তাঁর সবই তোমাদেরই জন্যে। একজনের পঁচিশ বছরের ছেলে মারা গিয়াছে, সে বলে—দেশে ধর্ম্মের শাসন থাক্‌লে কি এমন অকাল মৃত্যু ঘটে! ঠাকুর্দ্দা উত্তর দেন, তোর এখনও দু ছেলে আছে—আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল—একটি বাকী রইল না। ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া ক'রে রাজাকেও হারাব। এম্‌নি বোকা!

একজন বলিল, ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের! ঠাকুর্দ্দা জবাব দেন—তা সেই অন্ন রাজাকেই খুঁজে বের কর। ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না। অর্থাৎ যে যেভাবে পার ঈশ্বরের আরাধনা কর, তাহাতে আপত্তি নাই।

রাজার দুয়ারে সমস্ত দিন খেটেও আজ পর্য্যন্ত ঠাকুর্দ্দার দু'টো পয়সা পুরস্কার মিল্‌ল না। কিন্তু এই নিয়েই ঠাকুর্দ্দার অহঙ্কার—কারণ বন্ধুকে তো কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয় না। বরং যে সাধকের যত বেশী শক্তি, তাহাকেই তত বেশী সহ্য করিতে হয়। ইহাও বোধহয় একরকমের পরীক্ষা।

প্রাসাদ শিখরে সুদর্শনা ও সখী রোহিণীর কথোপকথনের দৃশ্যে দেখা যায় যে সুদর্শনা গর্ব্ব করিয়া বলিতেছেন যে অন্যেরা রাজাকে না চিনিতে পারেন কিন্তু তিনি কখনও রাজা সম্বন্ধে ভুল করিতে পারেন না। অথচ ভাগ্যের পরিহাস যে সুবর্ণর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই রাণী আসল রাজা ভাবিয়া ভুল করিলেন।

সুদর্শনা রোহিণীকে বলিলেন—এই পদ্ম পাতায় করে এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয়তো। রোহিণী ঘুরিয়া আসিয়া বলিল—আমি তো রাজার হাতে ফুল দিলুম কিন্তু তিনি যে কিছু বুঝলেন এমন তো মনে হ'ল না। কিছু বুঝলেন না, এইটি পাছে ধরা পড়ে সেইজন্যে একটি কথা কইলেন না। কিন্তু কাঞ্চীর রাজা বুঝতে পেরে সুবর্ণের গলা থেকে মুক্তার একগাছি মালা নিজে খুলিয়া লইল এবং দাসীর হাত দিয়া মহারাজের মালা বলিয়া রাণীকে পাঠাইল। রাণী সুদর্শনা এসংবাদে অপমানে জর্জ্জরিতা হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার রূপের মোহ কাটে নাই। এই অগৌরবের মালাটি রোহিণীর কাছ হইতে চাহিয়া লইলেন, পরিত্যাগ করিতে মনে বাঁধিল।

সুদর্শনাকে পাইবার আশায় কাঞ্চীরাজ প্রাসাদের এক কোনে আগুন ধরাইয়া দিল, কিন্তু সে আগুন এমন বিরাট আকার ধারণ করিল যে কাঞ্চী নিজেই বাহির হইয়া যাইবার পথ খুঁজিয়া পায় না। রাজবেশী সুবর্ণ এত ভয় পাইল যে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া জোর করিয়া সে অদৃশ্য রাজার কাছে রক্ষা পাইবার আশায় আবেদন সুরু করিল। রাণী যখন আত্মরক্ষার জন্য সুবর্ণের শরণাপন্ন হইলেন, তৎক্ষণাৎ সে স্বীকার করিল যে সে রাজা নয়। লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে সুদর্শনার মনে হইল যে ইহার চেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরাও ভাল। এই দারুণ বিপদের মাঝ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্ধকার কক্ষে লইয়া গেলেন আসল রাজা। বলিলেন—তোমার ভয় নেই—আগুন এখানে এসে পৌছবে না।

রাণীর মনে একদিকে অপরিসীম লজ্জা আবার অন্যদিকে তীব্র রূপের নেশা। এত কাণ্ডের পরও তিনি সুবর্ণর দেওয়া মালা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাকে তো আজ দেখে নিলে—কেমন দেখলে ?

সুদর্শনা বলিলেন—ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো! ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মত তুমি কালো। ঝড়ের মেঘের মত কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তা'রই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা—আমি তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, যে লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে, সে কখন আমাকে দেখে সইতে পারে না, আমাকে বিপদ বলে মনে করে আমার কাছ থেকে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেই জন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা রাজার এই ভয়ঙ্কর রূপ সহ্য করিতে পারিল না। রাজার কাছ হইতে সে দূরে পলাইয়া যাইতে চাহিল। রাজা কোনো বাধা দিলেন না, কোনো নিষেধ জানাইলেন না। এস্থলে রাণীর মনে বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে রাজার প্রতি একটা তীব্র অভিমানের ভাবও দেখা যায়। রাজার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইবার কালে একবার তিনি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন রাজার খোঁজে। সুরঙ্গমার কাছে শুনিলেন তিনি চলিয়া গেছেন। শুনিয়া অভিমানভরে কহিলেন—চলে গেলেন ? আচ্ছা বেশ, তাহলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন! আমি ফিরে এলুম কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না! আচ্ছা ভালই হোল তাহলে আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্য তিনি কি তোকে বলেছেন ?

সুরঙ্গমা—না, তিনি কিছুই বলেন নি।

সুদর্শনা—কেনই বা বলবেন? বল্‌বার কথা তো নয়! তাহলে আমি মুক্ত।

সুরঙ্গমা কিন্তু রাণীকে এই বিপদের দিনে পরিত্যাগ করিল না। —সে তাঁহার সঙ্গে চলিল। সুদর্শনা তাহাকে সঙ্গে নিতে আপত্তি করিলে বলিল—মা, তোমার সমস্ত ভালমন্দ আমি গায়ে মেখে নিয়েছি, আমাকে পর করে রাখতে পারবে না, আমি যাবই।

সুদর্শনা আসিয়া উপস্থিত হইল আপন পিত্রালয়ে। কিন্তু এখানে আসিয়া পদে পদে তাহাকে অপমানে জর্জ্জরিতা হইতে হইল। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার পিতা কান্যকুব্জরাজ ব্যবস্থা করিলেন যে এখানে তাহাকে দাসীর মত থাকিতে হইবে। ইহার কারণ "নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দেখা দেয়।"

রাজার প্রতি সুদর্শনার অভিমান আরও বাড়িতে লাগিল। তাহার এই দুঃসময়—রাজার কি উচিত ছিল না তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আসা। রাজার এ কি রকম ব্যবহার!

সুরঙ্গমা বলিল—সে ত সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনদিন টলাতে পারে? সুদর্শনার মনে তখনও বিশ্বাস সুবর্ণ তাহাকে আসিয়া উদ্ধার করিবে।

এর পরের দৃশ্য কাঞ্চীরাজের শিবির। সুদর্শনাকে লাভ করিবার জন্য কাঞ্চী সুবর্ণকে লইয়া সুদর্শনার পিতার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কান্যকুব্জরাজের আতিথ্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া কাঞ্চীরাজ দূতকে বলিয়া দিলেন তাঁহারা সুদর্শনাকে দাসীশালা হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন। কান্যকুব্জরাজ যদি সহজে কন্যাকে সমর্পণ না করেন, তবে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে বলপূর্ব্বক উদ্ধার

করিবেন। দূত বলিয়া গেল, তাহাদের রাজাও ক্ষত্রিয়, এই স্পর্দ্ধাবাক্যে তিনিও ভীত হইবেন না। সুবর্ণ কাঞ্চীকে বিরত করিতে চেষ্টা করিল, বুঝাইল, কান্যকুব্জকে ভয় না করিলেও হয়তো চলে কিন্তু যে অন্ধকারের রাজা হঠাৎ আসিয়া সকল কিছু ওলট পালট করিয়া দেন, যিনি কাঞ্চীর সমস্ত আটঘাট বাঁধিয়া বাগানে অগ্নিসংযোগের ব্যাপারটাও নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? কাঞ্চী কিন্তু তবু অদৃশ্য রাজাকে মানিতে চায় না। ও ব্যাপারটা অকস্মাৎ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাহার বিশ্বাস।

এরপর সংবাদ আসিল যে, অন্যান্য রাজারাও সুদর্শনা লাভের জন্য সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কাঞ্চী ঠিক করিল আরম্ভে সকলে মিলিয়া কাজ করিবে। কান্যকুব্জকে পরাজিত করিয়া পরে অন্য উপায় বাহির করিতে হইবে। এই সাত রাজার সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া সুদর্শনার পিতা বন্দী হইলেন। যুদ্ধ তো শেষ হইল—এবার বীরত্বের পুরস্কারটি কী ভাবে গ্রহণ করা যায়। কাঞ্চী বলিলেন, 'আমরা জয়মাল্য নিতে আসিনি, বরমাল্য নিতে এসেছি।' সুতরাং স্থির হইল স্বয়ম্বর সভায় সুদর্শনা যাঁর গলায় মালা দিবেন এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করিবেন। স্বয়ম্বর সভায় কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে ছত্রধর করিয়া আনিল। আশা হইল যে সুবর্ণের রূপে রাণী মুগ্ধ হইবেন, কিন্তু ছত্রধরের গলায় তো মালা দেওয়া যায় না, সুতরাং মালা লাভ হইবে তাহারই। সুদর্শনার কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীতে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে। রাজসভায় দূর হইতে সুবর্ণকে দেখিয়া সে সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করিল "ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম! না, না! সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর একটা কি দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়! ....ঐ সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ চোখকে কি দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে?"

সুরঙ্গমা উত্তর দিল, "সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।"

এইবার সুদর্শনা আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার অন্তরের সমস্ত দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকল অভিমান, সকল দৌর্ব্বল্য, সকল গ্লানি ব্যক্ত হইয়া পড়িল তাহার এই কথাগুলিতে— "রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জান্‌বে না? (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরি বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে,—এ দেহ আমি আজ সবার সমক্ষে ধূলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি, বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটী আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে— সেখানকার দরজা কেউ খোলেনি প্রভু! সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু, আসুক, সে তোমার মতই কালো, তোমার মতই সুন্দর—তোমার মতই সে মন হরণ করতে জানে—সে তুমিই সে তুমি!"

স্বয়ম্বর সভায় রাজাদের আসন কাঁপিয়া উঠিল, প্রথমে সকলে ভাবিলেন ভূমিকম্প। বাহিরে বাজনার শব্দ পাওয়া গেল— এবার রাজারা ভাবিলেন বুঝি সুদর্শনা তাঁহাদের ভাগ্যফল নিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রবেশ করিলেন, ঠাকুর্দ্দা যোদ্ধবেশে। তিনি বলিলেন "রাজা" আসিয়াছেন এবং এই সকল রাজাকে তিনি আহ্বান করিয়াছেন। তিনি নিজেকে এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর্দ্দা জানাইলেন যে, 'আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।' সকল রাজাই

তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য রাজার আহ্বান মানিয়া লইলেন। কেবল কাঞ্চী বলিলেন—'আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি রাজদূত, কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।'

কাঞ্চীর সাহসে অন্যান্য রাজারাও সাহস পাইলেন—ভাবিলেন, ওর সঙ্গে যোগ দিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেখাই ভাল।

যুদ্ধে এই সকল রাজারা অদৃশ্য রাজার কাছে পরাজিত হইলেন। সুদর্শনার মনে একদিকে আনন্দ ও অন্যদিকে লজ্জা। তাহার অভিমান এখনও সম্পূর্ণভাবে ঘুচে নাই। তাহার বিশ্বাস রাজা নিজে তাহার কাছে আসিবেন। ঠাকুর্দ্দা আসিয়া জানাইলেন রাজা যুদ্ধ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন, কিন্তু তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন না। সুদর্শনা ঠাকুর্দ্দাকে জিজ্ঞাসা করিল—'চলে গিয়াছেন'? তোমার বন্ধু এম্‌নি বন্ধু! .... কি কঠিন, কি কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলচি, বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না! ....আমাকেও কি সে চিন্‌তে দেবে না?"

ঠাকুর্দ্দা জবাব দিলেন—'দেবে বই কি,—নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে। সে তো সহজ লোক নয়।'

পরের দৃশ্যে নাগরিকদের কথাবার্ত্তা হইতে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে অন্যান্য রাজারা নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বাধিয়ে যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে গেল। লড়াই করেছিল বীরের মত একমাত্র কাঞ্চীরাজ। যুদ্ধশেষে পলাতক রাজারা—তারা ধরাও পড়েছিল—সবাই পেলে দণ্ড। কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্ত্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।

এরপর পথে এসে মিলিত হলেন কাঞ্চীরাজ, ঠাকুর্দ্দা, সুদর্শনা, সুরঙ্গমা—সকলের উদ্দেশ্য এক—রাজার সঙ্গে মিলিত হবেন। এ পথ মুক্তির পথ। কাঞ্চীর মনেও আজ কোন অহঙ্কার, কোন গর্ব্ব নেই—সুদর্শনা সব অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এসেছেন। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর।

শেষ দৃশ্য অন্ধকার কক্ষে রাজা ও রাণীর মিলনে। রাণী বলিলেন —"আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।"

রাজা—আমাকে সইতে পারবে ?

সুদর্শনা—পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম, সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম!

রাজা—তোমারি মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা—যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাজা—আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস, আলোয়।

সুদর্শনা—যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।"

এইখানেই নাটকের আখ্যায়িকার শেষ।

রাজা নাট্যে এক অভিনব পন্থায় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ এবং জগত চালনার ধারা প্রতীকের দ্বারা রূপায়িত করিয়াছেন। এই পৃথিবী যেন একটি রাজ্য—এখানকার রাজা অদৃশ্য এবং অরূপ; কারণ ঈশ্বর, যিনি জগতের রাজা, নিজেই যে তিনি নিরাকার এবং রূপাতীত। অথচ যা কিছু এ পৃথিবীতে ঘটিতেছে সকলই আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। যাহার অন্তর্দৃষ্টি আছে সেই বুঝিতে পারে সারা বিশ্ব প্রকৃতির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নিয়মের ধারা। বাঁধা সুরের একচুল এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। এই রাজার দেশে বাহিরের অনেক রাজা আসিল। অদৃশ্য রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ইহারা এ রাজ্য অধিকার করিবার নানারূপ প্রচেষ্টা করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকলেই পরাভূত হইল। এমনই হয় বটে। নিরাকার ভগবানকে কত উপায়ে কতবার সিংহাসন চ্যুত করিবার প্রচেষ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করা অসম্ভব। এই অদৃশ্য রাজাকে পাইতে হইলে বাহিরে খুঁজিলে চলিবে না। অন্তরের নিভৃতকক্ষে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। সুদর্শনা মানবাত্মার প্রতীক—সাধারণতই মানুষ ভাবে অন্যান্য জাগতিক বস্তুর মত ঈশ্বরকেও সহজেই চোখে দেখা যাইবে। মানুষের মন, আত্মাভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতিতে মোহগ্রস্ত। এ সকল মোহ দূর হইলে তবেই সে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারে।

রাজা নাটকে বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। অদৃশ্য রাজা স্বয়ং ভগবান। সুদর্শনা মানবাত্মার প্রতীক্। ভগবান স্বামীরূপে এই মানবাত্মার সহিত অন্ধকার কক্ষে প্রেম-মিলনে মিলিত হন। অন্ধকার কক্ষদ্বারা মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলকেই বুঝাইতেছে। এইখানেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি এবং অনুভব করা যায়। আবার একথাও ঠিক যে

ঈশ্বরকে শুধু অন্তরে পাইলেই চলিবে না—তাঁহাকে বাহিরেও পাইতে হইবে। এইজন্যই নাটকের শেষে রাজা বলিলেন—"এখানকার লীলা শেষ 'হল। এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস আলোয়!"

রাজা কালো—তাঁহাকে দেখিতে ভয়াবহ, ইহার কারণ ভগবানের কোন আকৃতি নাই। এই আকৃতিহীন অসীম ঈশ্বরকে মানুষের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তো ভয়াবহই মনে হইবে। সুবর্ণ মৃন্ময় সৌন্দর্য্যের প্রতীক্। আধ্যাত্মিকতাহীন চিন্ময়তাবর্জ্জিত এ সৌন্দর্য্যের তো সত্যকার কোন মূল্য নাই, এই জন্যই সুবর্ণ ভণ্ড এবং মেকী। অসীমের স্বর্গীয় আকর্ষণ অনুভব করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ মন যখন সঠিকভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই, তখন তাহাকে এই মৃন্ময় সৌন্দর্য্য উপভোগের মধ্য দিয়াই প্রস্তুত হইতে হইবে। ক্রমে মৃন্ময়তাকে পরিহার করিয়া গ্লানিমুক্ত এবং শুদ্ধ হইতে হইবে। তবেই সে একদিন অসীমকে পাইবার উপযুক্ত হইতে পারিবে। সুদর্শনা-সুবর্ণ আখ্যানের ইহাই তাৎপর্য্য। কাঞ্চী প্রবঞ্চক নয়। সে জড়বাদী—যাহা দৃশ্য তাহাকেই সে বিশ্বাস এবং গ্রাহ্য করে। তাহার কাছে অদৃশ্যের কোনো মূল্য নাই। তাহার ভিতর কোনো ভণ্ডামী বা শঠতা নাই। সে সাহসী এবং বীর। এই জন্যই অন্যান্য রাজারা শাস্তি পাইল, কিন্তু সে পাইল পরিত্রাণ। শুধু এই নয়; অদৃশ্য রাজা দ্বারা সে সম্মানিত হইল—কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্ত্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তা'র মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

সাঙ্কেতিক নাটক হিসাবে রাজার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সাধারণ বাস্তব-আখ্যানভাগ অতি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত হইতেছে আধ্যাত্মিক-আখ্যানভাগে। বাচ্যার্থ ব্যঙ্গার্থের

দিকে মনকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ব্যঙ্গার্থের ভিতর দিয়াই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রথম দৃশ্যে সুদর্শনা এবং রাজার কথোপকথনের মাঝে এক জায়গায় আছে—

"সুদর্শনা—আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি,—এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও ?

রাজা—পাই বৈকি।

সুদর্শনা—কেমন করে দেখতে পাও ? আচ্ছা, কি দেখ ?

রাজা—দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তা'র মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।"

অর্থাৎ সিন্ধু যেন বিন্দুর মধ্যে রূপায়িত। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

বাচ্যার্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এখানে প্রেমিক-মানব আবেগে অভিভূত হইয়া রূপবর্ণনার মাধ্যমে নিজের অন্তরের ভাবাবেগ তাঁহার প্রেমিকার কাছে নিবেদন করিতেছেন। ইহার ভিতর অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু সে অতিশয়োক্তি মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয়না। অথচ এই বাচ্যার্থের মধ্যেই মন নিবদ্ধ থাকিতে চাহে না। স্পষ্টই বুঝা যায় বাচ্যার্থ এখানে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। আরও গভীরতর সত্যের নির্দ্দেশ যেন ইহার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভাসে ইঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিতেছে। রাজা তো শুধু মানব-প্রেমিক নহেন, তিনিই যে আবার ঈশ্বর—সুদর্শনাকে যে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই

জন্যই স্রষ্টা হিসাবে নিজের সৃষ্টিকে তিনি এত বিরাট, মহৎ এবং সুন্দর হিসাবে দেখিতেছেন। আর একথা কে অস্বীকার করিবে যে সৃষ্টির ভিতর দিয়াই স্রষ্টার যত ধ্যান, জ্ঞান, আনন্দ, কৌশল প্রভৃতি রূপায়িত হয়। সৃষ্টিই স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি, উপমা, ছায়া! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গভীর ভাবে দেখিলে বুঝা যায় এ সীমা-অসীমের প্রেম-মিলনের কাহিনী। অসীম যেন সীমার মাঝে নিজের অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিতে পাইয়া উদাত্তস্বরে সীমার স্বর্গীয়-রূপের আরাধনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। Subjective, Objective-এর মাঝে নিজের রূপ আবিষ্কারে বিস্মিত, চকিত এবং মুগ্ধ।

কাঞ্চীরাজ সুবর্ণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া ঠিক করিল রাণীর প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে অগ্নিসংযোগ করিবে এবং ভীতা সুদর্শনা বাহিরে আসিলে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিবে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল ফল হইল উল্টা। অগ্নি এত শীঘ্র বিস্তার লাভ করিল যে তখন নিজেরাই প্রাণ লইয়া পরিত্রাণ পায় কিনা সন্দেহ। কাঞ্চীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। ইঙ্গিতে যেন এ স্থলে এই কথাই বুঝানো হইয়াছে যে অদৃশ্য রাজাই কাঞ্চীর এই আয়োজনকে ব্যর্থ করিলেন—না হইলে এত দ্রুত আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার তো সঙ্গত কোনো কারণ দেখা যায় না। অগ্নি-সংযোগের পূর্ব্বে পশুপক্ষী এবং মালীর দল বাগান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল—সকলেরই বিপদের ভয় হইয়াছে—রাজা তাহাদের আহ্বান করিয়াছেন চলিয়া আসিতে। এখানেও সাঙ্কেতিকতার নিদর্শন রহিয়াছে। পশুপক্ষী তাহাদের instinct-এর দ্বারাই তো বিপদ আসিবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে। তাহাদের এই বুঝিবার ক্ষমতা কোথা হইতে আসে? এমন কি এ-ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে মানুষও বিপদাগমের খবর আগে হইতেই বুঝিতে পারিতেছে—নহিলে মালীর দলই বা আগে হইতে বাগান ত্যাগ

করিতে চাহিবে কেন ? এ স্থলেও অতীন্দ্রিয় শক্তির—অর্থাৎ যে শক্তি সকল কিছুকে পরিচালনা করিতেছে—মানবিক শক্তি যাহার সহিত তুলনায় অতি ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর—প্রতিই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই অদৃশ্য রাজার রাজত্বে রাজাকে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই অতি সুন্দর একটি শৃঙ্খলার ভাব বিরাজ করে। এ রাজা তাঁর প্রজাদের সবাইকেই যেন রাজা করে দিয়েছেন। এ রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। এ রাজার সম্বন্ধে কবিকেশরী গান বাঁধিয়াছেন—

"আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে।" ইহার অর্থ ঠিকভাবে ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই Dr. Thompson এখানে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

Thompson এর মতে—

Raja shows with striking intensity what may be called his republicanism........His plays have plenty of kings ; but they are usually abdicating, or wanting to abdicate, or in the end learn to abdicate—that is, the true kings, the kinglets often being rascals, mere foils for their overlord's virtues. The king in Raja refuses to exercise any of the ordinary prerogatives of kingship, to punish treason or resent insult.

'রাজা' নাট্যে রিপাব্লিক্যানিজম্ বা ডেমোক্র্যাসী ইত্যাদি থিওরির আরোপ হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে রাজনীতির আলোচনা করিতে বসেন নাই তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। তাঁহার আলোচ্য বিষয় আধ্যাত্মিকতা। ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান—সবাই রাজা—কেহ কাহারো অপেক্ষা বড়ও নহে—

হীনও নহে। কারণ সকলেরই মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি বিদ্যমান। ঈশ্বরের রাজত্বে সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত, তথাপি কোথাও নিয়মের এতটুকু ব্যাতিরেক দেখা যায় না—কোথাও ছন্দ পতন হয় নাই।

এইবার প্রধান চরিত্রগুলির আলোচনা করিব—

রাজা—রাজা বলিতে ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে। "ঈশ্বর জ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন। তিনি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় হইতে অনন্তগুণ উচ্চে" (জ্ঞানযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ)। বুদ্ধির দ্বারা এই অনাদি অনন্ত অসীম অতীন্দ্রিয় সত্তাকে বুঝিবার চেষ্টা করা বাতুলতা। বরং সহজ প্রাজ্ঞের দ্বারা (intuition) তাঁহাকে অনুভব করা যায়।

অন্ধকার ঘরে রাজা, রাণী সুদর্শনা বা মানবাত্মার সহিত নির্জ্জনে মিলিত হন। 'এ-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরী।' অর্থাৎ পৃথিবীর জড়-সত্তাকে অতিক্রম করে তার অন্তর্লীন রহস্যের উৎসস্থলে উপনীত হইলেই মানবাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

বাহিরের যে আলোক আমরা দেখতে পাই তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি আনিতে পারে, চোখ-মাতানো হইতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু মানব জীবনের কোনো কিছু বড় সমস্যা, চিন্তার বিষয় বা গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রশ্নের কতটুকু রূপ আমাদের দৃষ্টির গোচর করিতে সমর্থ হয়। এ সকলের সমাধানের জন্যই মানবাত্মার প্রয়োজন হয় সেই অন্ধকারের স্বামীকে যিনি সকল আঁধারের স্তরে স্তরে এবং অন্তরে অন্তরে অদৃশ্য-আলোকরূপে বিরাজমান; যিনি স্বয়ং নিখিল জ্যোতির জ্যোতি। মানবাত্মা যে অবধি না নিজের মৃন্ময়তাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহার নিজের এই জড়ত্ব ছায়ার আচ্ছাদন বিস্তার করিয়া রাখে তাহার দৃষ্টিপথে। ঈশ্বর এই সময় তাহার কাছে অন্ধকারের

প্রভু, অস্পষ্ট, অদৃশ্য, কালো এবং ভয়ঙ্কর। সাধনার দ্বারা যে মুহূর্ত্তে মানবাত্মা চিন্ময়তা লাভ করে, ঈশ্বর আসিয়া বলেন "আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হ'ল। এস, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এস—আলোয়।"

দাসী সুরঙ্গমা এক সময় নষ্ট হইবার পথে গিয়াছিল, এর জন্য দায়ী ছিল তাহার মদ্যপ এবং জুয়াড়ী পিতা। রাজার কাছে উভয়ে কঠোর শাস্তি পাইল। প্রথমে নিষ্ঠুর মনে হইলেও পরে এই রাজার প্রতিই সুরঙ্গমার অগাধ ভক্তি জন্মিল। কিন্তু কেন? জীবনে নানা ব্যাপারেই আমাদের মনে ঈশ্বরের বিচার সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জাগে। ধাতুকে যেমন খাঁটি করিতে হইলে আগুনে গালাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তেমনি যাহারা নষ্ট হইবার পথে যায় তাহাদের শাস্তির-আগুনে শোধন করিয়া নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। এখানে দয়া, মায়া দেখাইলে চলে না—আমাদের মঙ্গলের জন্যই অনেক সময়ে ঈশ্বরকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়। এই কঠোরতার জন্যই ঈশ্বর নিখিলের অটল নির্ভর।

সুরঙ্গমার মতে—সুন্দর বললে রাজাকে ছোট করা হয়। মানুষের চর্ম্মচক্ষে যা সুন্দর মনে হয়, সত্যিকার সৌন্দর্য্য তাহার মধ্যে নাও থাকিতে পারে। সেদিক দিয়া বিচার করিলে রাজাকে সুন্দর বলা যায় না—তিনি অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য। শেষ দৃশ্যে সুদর্শনাও বলিতেছেন—'তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।'

রাজার সম্বন্ধে সুরঙ্গমার এমন একটি বোধ জন্মিয়া গেছে যে, সে সহজেই তাঁহার আগমন এবং প্রত্যাগমনের খবর বুঝিতে পারে। তিনি আসিবার আগে আগে সে-বারতা বহিয়া আনে বাতাসে এবং বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া-আসা-সুগন্ধে। রাণী সুদর্শনার এ বোধ হয় নাই। কারণ সুরঙ্গমা যে-ভাবে রাজার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে,

সুদর্শনা তাহা পারেন নাই। তাঁহার মনে আছে চাঞ্চল্য, রাজাকে দেখিবার জন্য তীব্র কৌতূহল। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব না আসিলে তো ঈশ্বরকে অনুভব করা যায় না। আত্মাভিমানই সুদর্শনার সকল সর্ব্বনাশের মূল কারণ। দাসী হইয়া সুরঙ্গমা রাজাকে দেখিতে পায়, অথচ তিনি রাণী হইয়া তা পারেন না। এ কেমন কথা! কিন্তু ঈশ্বর যে আমাদের প্রভু—তাঁহার দাসত্বে তো কোনো লজ্জার বা অপমানের কথা নাই। এই প্রসঙ্গে মীরাবাঈ-এর ভজন মনে পড়ে—"ম্যয়নে চাকর রাখো জী।"

সুদর্শনা চান আলোয় হাজার জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে রাজাকে দেখতে। রাজা বলেন, "তুমি সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে" ঈশ্বর যে অসীম এবং অরূপ। কোনো বিশেষ রূপের ভিতর আবদ্ধ করিতে গেলে তাঁহাকে ভয়ঙ্করই তো দেখাইবে। বিরাটকে ক্ষুদ্রভাবে দেখিতে যাওয়ার প্রচেষ্টাই যে অস্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা তো বাতুলতারই নামান্তর। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ আছে—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমিতাস্তে ভবন্তি॥

অর্থাৎ, ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। হৃদয়ের পবিত্রতা এবং হৃদয়ের ঐক্যজ্ঞানের সাহায্যে এই অন্তরস্থিত ব্রহ্মকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমর। শ্রীঅরবিন্দের "The Life Divine" পুস্তক হইতে এখানে কিছুটা তুলিয়া দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

It is the might of the Godhead in the world that turns the wheel of Brahman. Him one must know, the supreme Lord of all lords, the supreme Godhead above all Godheads. Supreme too is his Shakti and manifold the natural working of her knowledge and her force. One Godhead, occult in all beings, the inner Self of all beings, the all-pervading, absolute without qualities, the overseer of all actions, the witness, the knower.

Swetaswatara Upanishad.

There is then a supreme Reality eternal, absolute and infinite. Because it is absoluate and infinite, it is in its essence indeterminable. It is indefinable and inconceivable by finite and defining Mind ; it is ineffable by a mind-created speech ; it is describable neither by our negations, neti neti,—for we cannot limit it by saying it is not this, it is not that,—nor by our affirmations, for we cannot fix it by saying it is this, it is that, iti iti. And yet, though in this way unknowable to us, it is not altogether and in every way unknowable ; it is self-evident to itself and, although inexpressible, yet self-evident to a knowledge by identity of which the spiritual being in us must be capable ; for that spiritual being is in its essence and its original and intimate reality not other than this Supreme Existence.

(Sri Aurobindo—The Life Divine Vol II, Chap II)

ঈশ্বরের এই বর্ণনার সহিত অদৃশ্য রাজার কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য এবং মিল। রাজার কত বিচিত্র রূপ সুদর্শনা কল্পনায় রূপায়িত করেন। তবু তিনি চান একটি বিশেষ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিতে। রাজা বলেন, "সেটা যদি তোমার মনের মত না হয় তবে তো সমস্ত গেল।" সুদর্শনার দৃঢ় বিশ্বাস সে রূপ নিশ্চয় মনের মত হইবে। রাজা উত্তর দেন, "মন যদি তার মত হয় তবেই সে মনের মত হবে। আগে তাই হোক!" সত্যই তো, ঈশ্বরের নানা রূপের প্রকাশ বহুরূপে আমাদের চারিদিকে প্রতিভাত। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই প্রথমে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে শেখার দরকার, পরে মন তৈয়ারী হইলে ঐ বৈচিত্র্যের ভিতর হইতেই পরম-ঐক্যের আবিষ্কার সম্ভব হইয়া থাকে।

বাহিরে যাহা বহু, অন্তরে তাহা এক। জগতে যাহা কিছু বিচিত্র এবং সুন্দর সকলের মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছে সেই অসীম সত্তার রূপের বিভা। কিন্তু অন্তরের ধ্যানের ক্ষেত্রে সকল বৈচিত্র্য বর্জ্জন করিয়া তিনিই আবার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' সমস্ত অন্তর ব্যাপিয়া তাঁহার স্থান। মানস ক্ষেত্রে তিনিই একটি মধুর উজ্জ্বল স্বপ্নের মত রমণীয়—হৃদয়বৃন্তে তিনিই একটি মাত্র পদ্ম। অসীম চিত্তাকাশে তিনিই যেন একমাত্র চন্দ্র, আর তাঁহাকে ব্যাপিয়া চারিদিকে বিরাট অন্ধকার—ইহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন আরও অধিক বিকশিত। কিন্তু এ বোধ তো সহজে আসে না—এর জন্য মনকে বহু শ্রম, বহু আয়াস, বহু সাধনা এবং বহু ধ্যান করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

All roads lead to Rome. ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার কোনো বিশেষ বাঁধাধরা পথ নাই; যে যে ভাবেই তাঁহার সাধনা করুন না কেন তাহাতেই ফল হইবে। ভগবানের রাজত্বে সব রাস্তাই খোলা রাস্তা। তিনি এক জায়গায় দেখা দেন না। এই জন্যই সব জায়গা

তাঁহাকে দিয়া ঠাসা রহিয়াছে। মূর্খেরা এ-কথা বুঝিতে পারে না, ভাবে রাজা বুঝি নাই—সব ফাঁকা।

ঈশ্বরের বিচার পদ্ধতি অতি অভিনব। অনেক সময়েই দেখা যায় যাঁহারা অতি ভক্ত, অতি ভগবদ্ বিশ্বাসী তাঁহারাই যেন বেশী করিয়া শাস্তি পাইতেছেন। তাঁহাদের ঘরে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই, মৃত্যু ক্রমাগত তাঁহাদের উপর আঘাত হানিতেছে। The Book of Job প্রভৃতিতেও এ সমস্যার আলোচনা হইয়াছে। মানুষের বুঝিবার শক্তি কতটুকু! যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর তাহার রহস্য তো অত সহজে সমাধান হইবার নহে। ইহাকে বুঝিবার জন্য মনকেও তৈয়ারী করা দরকার—যেমন হইয়াছে ঠাকুর্দ্দার ক্ষেত্রে—তাই শত দুঃখের মাঝেও শোককে দূরে সরাইয়া ঠাকুর্দ্দা গাহিতে পারেন—

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।" ইত্যাদি

আগুনের হাত হইতে সুদর্শনাকে রাজা রক্ষা করিলেন, কিন্তু সুদর্শনা যখন দূরে চলিয়া যাইতে চাহিলেন তখন বাধা দিলেন না। রাণীর ইহাতে অভিমান হইল—এ কথা তিনি বুঝিলেন না যে রাজা হইতে আমরা কখনো দূরে সরিয়া যাইতে পারি না। নিজের প্রাসাদে থাকিবার কালে সন্ধ্যার সময় বাসর ঘরের অন্ধকার হইতে যে সঙ্গীতধারা শুনিতে পাইতেন, পিত্রালয়ে আসিবার পরেও জানালার নীচে অন্ধকার হইতে কতবার সেই সঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বসময় সর্ব্বত্র আমাদের কাছে কাছেই থাকেন।

বিদ্রোহী রাজারা যখন সভায় একত্রিত হইয়াছেন এবং সুদর্শনার স্বয়ম্বরা হইবার সকল ব্যবস্থাই প্রস্তুত এমন সময় সভায় প্রবেশ করিলেন ঠাকুর্দ্দা এবং ঘোষণা করিলেন অদৃশ্য রাজার আহ্বান। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন রাজার একজন সেনাপতি হিসাবে। এমনই হয় বটে!

যুগে যুগেই দেখা যায় যখন পৃথিবী অবিশ্বাস, বিদ্রোহ এবং গ্লানিতে ভরিয়া ওঠে—তখন রাজার আহ্বান জানাইতে আসেন যে সকল ব্যক্তি, বাহির হইতে দেখিয়া তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে প্রথমটায় বিশ্বাস হইতে চাহে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি যে অন্য জিনিষ,—অন্তরে অন্তরে ইঁহারা কে কত শক্তিমান্ বাহির হইতে এ-কথা কিরূপে বুঝা যাইবে। রাজা তো আর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাশবিক যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন না—তাঁহার যুদ্ধ আধ্যাত্মিক—এ যুদ্ধে ঠাকুর্দ্দাই তো তাঁহার যোগ্য সেনাপতি।

এক হিসাবে রাজা বড় নিষ্ঠুর। সমস্ত মান, অভিমান, লজ্জা সঙ্কোচ ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই রাজা বা ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত এবং অসীম। তিনি জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন—এই উভয়ের অনন্তগুণ উচ্চে। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা—অন্তরের অন্তরতম। সীমার ভিতর দিয়া তাঁহার রূপের আভাস পাওয়া যায়। সীমার মধ্যেই তাঁহার অনুপম রূপের উপমা প্রতিফলিত।

সুদর্শনা—সুদর্শনা মানবাত্মার প্রতীক। অদৃষ্টের লিখন অনুসারে ধরিত্রীমাতা যাঁহার হাতে মানবাত্মাকে সমর্পণ করেন তিনিই ঈশ্বর। এই জন্যই ঈশ্বর আমাদের জীবনস্বামী, হৃদয়বল্লভ এবং অন্তরতম।

বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর সৃষ্টির ভিতর দিয়াই আপন অসীম সৌন্দর্য্যকে রূপায়িত করেন। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

“যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে যে হয়নি তোমার দেখা
....
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে.........ইত্যাদি”

সৃষ্টির চরম সার্থকতা হইয়াছে মানুষ সৃষ্টিতে। এই কথাটাই বুঝাইতে গিয়া রাজা সুদর্শনাকে বলিতেছেন, "দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটী জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!" ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ যাহা কিছু দেখিতে পারে, জানিতে পারে, শুনিতে পারে বা বুঝিতে পারে তাহা সকলই জড় এবং পার্থিব। কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব, অতি সূক্ষ্ম এবং আধ্যাত্মিক, সে সকলকে তো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অন্তর্মুখী না হইলে অসীম ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। বুদ্ধির দ্বারা যে জগৎকে জানা যায় তাহার পরিধি খুবই ছোট। এই জন্যই দরকার, বুদ্ধির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া একটা বড় বা সমগ্র দৃষ্টিতে কল্পনায় সকল কিছুকে জানিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করা। মানুষ যতক্ষণ না অনুভব করে যে তাহার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির অংশ রহিয়াছে ততক্ষণ সে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না কোন অসীম শক্তির কণা-মাত্র পাইয়া সে আজ জীবজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহার মধ্যে অভিমান, অহঙ্কার, বুদ্ধির গর্ব্ব ও ইন্দ্রিয়াদির প্রভাব অতিমাত্রায় বেশী। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে নিজেকে আবিষ্কার করিতে শেখে তখন সব কিছু জলের মত পরিষ্কার হইয়া যায়। আত্মাভিমান ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ না করা অবধি মানুষের মুক্তি নাই। এই খানেই সুদর্শনা ভুল করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহিরের অন্যান্য জিনিষের ন্যায় সে ঈশ্বরকে আলোতে দেখিতে চাহিয়াছিল। বুদ্ধির দ্বারাই সব কিছু বুঝা যায়, এই ছিল তাহার ধারণা। চোখের মায়ার ধাঁধাঁয় পড়িয়া নকল রাজা সুবর্ণকেই আসল রাজা বলিয়া ভুল করিল। ফলে

চারিদিকে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইল। সাত রাজা তাহাকে লইয়া টানাটানি সুরু করিলেন। নিষ্ঠুর দেবতা যেন আগুনের দ্বারা তাহার ভিতরকার সকল কালোকে দগ্ধ করিলেন, তাহাকে শুদ্ধ এবং পবিত্র করিয়া তুলিলেন। এইবার সে বুঝিতে শিখিল অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে না শিখিলে বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। রূপের মোহই হইল সুদর্শনার কাল। বাহিরের রূপ যে সর্ব্বনাশের পথে আকর্ষণ করে এ তথ্য জানা না থাকাতেই সে উন্মত্তের ন্যায় সুবর্ণের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভুল যেদিন ভাঙ্গিল তখন বুঝিল, বাহিরের রূপটা মায়া, ভিতরের রূপটাই আসল রূপ।

সুরঙ্গমা—এই চরিত্রটি মধুর ভক্তিরসের প্রতীক। অকপটভাবে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান এবং অনুভব করাই সুরঙ্গমার জীবনের একমাত্র ব্রত। ভগবানে তাহার পরম প্রেম—অন্তর তাহার ঘৃণাশূন্য। সুদর্শনা যখন রাজার উপর রাগ করিয়া দূরে চলিল, এবং কেহই তাহার সঙ্গে যাইতে রাজী হইল না, তখন একমাত্র সুরঙ্গমাই তাঁহার সঙ্গ লইল। অন্যের পাপের কলঙ্কভাগী হইতে তাহার আপত্তি নাই, অন্যের পাপের শাস্তি অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতেই তাহার আনন্দ। ঈশ্বরে তাহার অবিচলিত নিষ্ঠা, অদ্ভুত বিশ্বাস এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব।

এক হিসাবে সুরঙ্গমা, সুদর্শনা চরিত্রের foil. সর্ব্বসময় সে রাণীর পাশাপাশি থাকাতে রাণীর চরিত্রটী যেন আরও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'বুদ্ধিই' যে মানবজীবনের সকল রহস্যের সমাধান নহে—ঈশ্বর যে ইন্দ্রিয়াতীত—অথচ ভক্তিতেই যে তাঁহাকে অতি সহজে লাভ করা যায়—এই সকল সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে সুরঙ্গমা চরিত্রটি!

ভক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"ভক্তি-যোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরমলক্ষ্য ঈশ্বরে পৌছিবার

অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা……পরাভক্তিতে অভিভূত ব্যক্তি, প্রেমস্বরূপ ভগবানের এত নিকটে পঁহুছিয়াছেন যে তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণা-ভাব বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।

…………ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, 'যাহারা আমাতে নিরন্তর আসক্ত ও আমাকে প্রেমের সহিত উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।'

….. ভক্ত এমন এক পথে বিচরণ করিতেছেন, যাহা শীঘ্রই তাঁহাকে যুক্তির কুহেলিকাময় ও অশান্তিপ্রদ রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষানুভূতির রাজ্যে লইয়া যাইবে; তিনি শীঘ্রই ঈশ্বর কৃপায় এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের প্রিয় অক্ষম যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, আর বুদ্ধির সাহায্যে অন্ধকারে বৃথান্বেষণের স্থানে প্রত্যক্ষানুভূতির উজ্জ্বল দিবালোকের প্রকাশ হয়। তিনি তখন বিচার বা বিশ্বাস কিছুই করেন না! তিনি একরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। তিনি আর তর্ক করেন না, প্রত্যক্ষ করেন। আর এই ভগবানকে দেখা, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ও তাঁহাকে সম্ভোগ করা কি অন্যান্য সমুদয় বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ নহে? শুধু ইহাই নহে, অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা ভক্তিকে মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।" (ভক্তিযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ)

সুরঙ্গমার কাছে রাজার স্বরূপ অজ্ঞাত নয়। রাজার পদধ্বনির শব্দ তাহার বুকের মাঝে বাজিতে থাকে। তাঁহার অভ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে সে বাতাসে সুগন্ধের আঘ্রাণ পায়। সে জানে, ঈশ্বর কৌতূহলের সামগ্রী নহেন। সহজ হইতে পারিলেই, সেই শিব-সত্য-সুন্দরকে পাওয়া যায়। আত্মবোধ বিসর্জ্জন দিয়াই সে এত সহজে রাজাকে পাইয়াছে। ঈশ্বরের নিষ্ঠুর রূপও তাহার অজ্ঞাত নয়। সে একথাও জানে যে বিপদের সময়ে ভগবান সকল সময়েই

আমাদের কাছে কাছেই থাকেন। সুদর্শনা যখন রাজাকে ছাড়িয়া চলিল, তখন সুরঙ্গমাও সঙ্গ লইল। বলিল, 'মা তোমার ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি।' সুরঙ্গমা শুধু অন্তরের নিভৃত কোণে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া নিজের আত্মোন্নতিতেই নিবদ্ধ নহে। বাহিরের জগতের অন্যান্যের সুখ দুঃখকেও সে নিজের বলিয়া লইতে জানে।

ঠাকুর্দ্দা—ঠাকুর্দ্দা চরিত্রটি প্রজ্ঞা-জ্ঞানের প্রতীক। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাজা বা ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে জানেন। এই পার্থিব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনে দুঃখকে বাদ দেওয়া যায় না, এ-কথা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। সুতরাং এই স্থূল, ভৌতিক জীবনকে অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনকে না গ্রহণ করিলে পরিত্রাণ নাই এ-কথা ঠাকুর্দ্দা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। নহিলে অতগুলি সন্তানের মৃত্যু-শোকের পরও তিনি নিজেকে এভাবে শান্ত, সংযত এবং সংহত রাখিতে পারিতেন না।

ঠাকুর্দ্দার মধ্যে বুদ্ধি এবং হৃদয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় ঘটিয়াছে। গভীরভাবে নিজেকে জগৎকে এবং ঈশ্বরকে জানিতে হইলে অনন্ত হৃদয় এবং অনন্ত বুদ্ধি শক্তির প্রয়োজন। ঠাকুর্দ্দার মধ্যে এ-সকল গুণ বিদ্যমান।

অনন্ত হৃদয় এবং অনন্ত জ্ঞান আছে বলিয়াই অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের স্বরূপকে ঠাকুর্দ্দা চিনিয়া লইয়াছেন। তাই তিনি বলিতে পারেন—"সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।" ঠাকুর্দ্দা যেন বসন্তের অগ্রদূত। তিনি দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে চান। সব রাস্তা গানে ভাসাইয়া দিয়া চলিবেন এই তাঁহার অন্তরের বাসনা। গানে গানে তিনি সর্ব্বস্থান ছন্দে ভরিয়া দিতে চাহেন—কারণ তিনি জানেন ছন্দোময় হইয়া উঠিতে পারিলেই ছন্দের-রাজা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। জগতকে তিনি ব্রহ্মভাবে দেখিতে

শিখিয়াছেন—প্রত্যেক বস্তুর এবং জীবের অভ্যন্তরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ। তাই বলিতে পারেন "আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে"—এবং "সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।"

ঠাকুর্দ্দা রসরাজ—সকলের সঙ্গেই তাঁহার প্রেমের মধুর সম্পর্ক। সকলকেই তিনি স্নেহ করেন এবং প্রত্যেকেই তাঁহাকে ভালবাসে।

প্রথম হইতেই সুবর্ণ তাঁহাকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। না দেখিয়াই সুবর্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে?..............কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ বাঁধিয়ে বেড়ায়।........আমার রাজার মর্জ্জি বরাবর ঠিক আছে।"

ঠাকুর্দ্দা জানেন রাজা ননীর পুতুল নহেন—তাঁহাকে ছায়া করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা বাতুলতা। তিনি এমনভাবে সকলের সঙ্গে মিশিতে পারেন যে, সাধারণের থেকে তাঁকে আলাদা বলে চেনাই যায় না।

ঈশ্বর কিছু চান না—এজন্যই, "ভিক্ষুকের কর্ম্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোট ভিক্ষুক বড় ভিক্ষুকেই রাজা বলে মনে ক'রে বসে। আজ যে লোকটা গা ভরা গয়না পরে রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে, তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস্!"

ঠাকুর্দ্দার সঙ্গীর দল যত শিশু এবং অকিঞ্চনেরা। শিশু-ভোলানাথের দলে থাকিয়াই তিনি বোধ হয় আসল ভোলানাথকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। আর দরিদ্র নারায়ণদের মাঝেই তিনি নারায়ণের দেখা পান। রাজা রাজড়াদের তিনি পরিহার করিয়া চলিতেই ভালবাসেন কারণ কোনো কিছুতেই ইহাদের তুষ্টি

সাধন সম্ভব নয়। অথচ গরীবের দল এত সরলতায় ভরা যে এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেই ভাবে ওদের কত সেবা করা হল। ঠাকুর্দ্দার মধ্যে বাসনা নাই। এইজন্যই তিনি দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। তিনি জানেন যে, স্বর্গরাজ্য প্রত্যেকের ভিতরে। যাহার দেখিবার চোখ আছে, সেই সে স্বর্গকে দেখিতে পায়—যাহার শুনিবার কাণ আছে সেই সেখানকার অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সুর-লহরী শুনিতে পায়। এ সত্য তাঁহার অজ্ঞাত নয় বলিয়াই ঠাকুর্দ্দা চিরানন্দময়—রসে, রঙে এবং সঙ্গীতে সদা ভরপুর।

সমুদয় জগৎ যেন তাঁহার কাছে একটি চমৎকার কবিতার মত। অনন্ত আনন্দ এবং আবেগের প্রেরণায় এই সুন্দর কবিতাটি রূপায়িত। কত শ্লোক, কত ছন্দ, কত তাল, সুর, লয়, মূর্চ্ছনা এবং ব্যঞ্জনায় তাহা বিকশিত এবং প্রকাশিত। জগতের এই সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ, চকিত এবং বিস্মিত। এই কবিতার মনোহারিত্বই তাঁহাকে ইহার স্রষ্টা সেই আদি কবির মহত্ত্ব এবং বিরাটত্বের স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছে। বুঝাইয়া দিয়াছে—তাঁহাকে—ধর্ম্মবিজ্ঞানে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে। যিনি সকল একত্বের মূল কারণস্বরূপ। যাঁহাকে জানিলে আমাদের সকল অজ্ঞান দূর হইয়া যায় এবং অজ্ঞানতা অপসারিত হইলেই বহুত্বের ভুল ধারণাও সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যায়। মানুষে মানুষে তফাৎ, নরনারী ভিন্ন, জাতি হইতে জাতি পৃথক, এই বোধই সকল দুঃখের কারণ। এই পার্থক্য বাহিরের। সকল কিছুর ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় সর্ব্বত্রই ঐক্য-সূত্র বিদ্যমান। মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, জাতি জাতি হইতে ভিন্ন নহে, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র সকলেই এক, সকলের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। এই সকল আভ্যন্তরিক সত্য ঠাকুর্দ্দা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন—এইজন্যই তিনি সত্যকার বৈরাগী এবং মুক্তপুরুষ।

কাঞ্চী—কাঞ্চীরাজ প্রত্যক্ষবাদী। এইজন্যই সে ঘোর-নাস্তিক; যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না তাহাতে তাহার কোনো প্রকার বিশ্বাস নাই। ঈশ্বর বা রাজাকে যখন চোখে দেখা যায় না তখন তিনি নাই এ বিষয়ে কাঞ্চী নিঃসন্দেহ। তাহার চরিত্র সহজ সরল এবং নির্ভীক। সে বিদ্রোহী, পূর্ণমাত্রায় বিদ্রোহী। একেবারে রাজার রাণীকেই সে অধিকার করিতে চায়। এ বিষয়ে তাহার কোনোরকম সঙ্কোচ, ভয় বা দৌর্ব্বল্য নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যেমন কঠিন, তেমনি আবার প্রকৃত নাস্তিক হইতেও অত্যন্ত বেশী মনের জোরের দরকার।

অন্যান্য রাজাদের মনে অদৃশ্য রাজা সম্বন্ধে দ্বিধা আছে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো মতবাদে আসিবার মত সাহস এবং মনের শক্তি উঁহাদের নাই। ঠাকুর্দ্দার কাছে অদৃশ্য রাজার আহ্বান শুনিয়া উঁহারা প্রথমটায় ভয় পাইল। পরে কাঞ্চীর সাহস দেখিয়াই তবে যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্যত হইল। যুদ্ধকালে এই সকল রাজারা লড়াইয়ের দিকে চোখ না দিয়া নিজেদের দিকেই মনঃসংযোগ করিয়াছিল। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা অন্যেরা মরুক, আর ফলভোগ করিবে সে নিজে একা। একমাত্র বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছিল কাঞ্চীর রাজা—সে যেন হারিয়াও হারিতে চাহিতেছিল না। যুদ্ধ শেষে অন্যেরা পাইল শাস্তি। কিন্তু বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ অদৃশ্য রাজা তাহাকে দিলেন পুরস্কার—নিজের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া তাহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।

আসলকে জানিতে না পারিলেও নকলের ফাঁকি তাহার চোখ এড়াইতে পারে না। এই জন্যই প্রথমেই সে সুবর্ণকে নকল বলিয়া ধরিয়া ফেলিল।

কাঞ্চী তেজস্বী এবং সত্যাশ্রয়ী। যতটা সে বোঝে সেই

অনুসারে সে সত্য বিচার করে। তাহার বুদ্ধি এবং বিচার শক্তি দ্বারা সে রাজার অস্তিত্বের সত্যতা ধরিতে পারে না, সুতরাং নির্ভীক ভাবে রাজাকে অস্বীকার করে। এই জন্যই—তাহার মনের মধ্যে কোনো গ্লানি বা মিথ্যার কলুষ নাই। এই জাতীয় সত্যকার নাস্তিকদের মুক্তি হইতেও বিলম্ব হয় না। একবার জ্ঞানালোকের উন্মেষ হইলেই তাহাদের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়া যায়। ইহাদের মনে কোন রকম মেকী কিছু নাই বলিয়া সহজেই আবার ইহাদের উদ্ধার সাধন হয়। এই সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে কাঞ্চী চরিত্রের ভিতর দিয়া। এই তো গেল চরিত্রগুলির মোটামুটি আলোচনা।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'জ্ঞানযোগ' পুস্তকে এক জায়গায় বলিতেছেন ঃ—

"বেদান্ত বলেন, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাট-স্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ? যদি রাজা পাগল হইয়া আপন দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায়', বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার উদ্দেশ পাইবেন না, কারণ তিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি প্রত্যেক গৃহ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, তিনি মহা চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ পাইবেন না; কারণ তিনি নিজেই রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা, আর এই রাজার অন্বেষণরূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত বলেন, এইরূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট ও সুখী হইতে পারি। —কর্ম্মজীবনে বেদান্ত—"জ্ঞানযোগ"

উপরি উক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে "রাজা" নাটকের সারাংশ যেন বিবৃত হইয়াছে। নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব কর—তিনি বাহিরে নাই। এই অনুভবের দ্বারাই মুক্তি আসিবে।

রাজা পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটক। এ নাটকে সুদর্শনা, সুরঙ্গমা, সুবর্ণ প্রভৃতি নামগুলিও ইঙ্গিতময়।

"আমার ধর্ম্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ ক্রমে রাজা নাটকের আলোচনা করিয়াছেন:

"রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হ'য়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা-কিছু সৃষ্টি কর'ছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হলো না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য তাতেই আনন্দ।"

অরূপরতনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায় ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র, তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ

ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাঁধিয়া গেল,—সেই অগ্নি-দাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, যে-প্রভু কোন বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দ রসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

The King of the Dark Chamber নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সি. এফ্. এনড্রুজ মহাশয়কে লেখেন :

'With regard to the criticism of my play, *The King of he Dark Chamber* that you mention in your letter, the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarshana is not more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature."

———

অচলায়তন

১৩১৮ সালে এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত অভিনয়োপযোগী সংস্করণ "গুরু" প্রকাশিত হয় ১৩২৪ সালে। এই নাটকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া কবি স্বয়ং বলিতেছেন—

"যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিক-দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তাকে শত্রু বলেই মনে করি। তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেন না নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙ্গতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু তিনি যে সমরোহ করে আসবেন তার জন্যে আয়োজন অনেকদিন থেকে চল্‌ছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকী রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই তো হঠাৎ আগুন জল্‌ল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল,—তাই তো যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, আপন সম্পদ ছেড়ে পথের ধূলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে

অভিসারে যেতে হচ্ছে। এই কথাটাই গীতালির একটি গানে আছে—

একহাতে ওর কৃপান আছে
আরেক হাতে হার,
ও যে ভেঙ্গেচে তোর দ্বার!

—আমার ধর্ম্ম, প্রবাসী পৌষ ২৯৭ পৃষ্ঠা।'

/সংস্কার, আচার, প্রথা প্রভৃতির অন্তর্নিহিত ভাবটাকে হারাইয়া যখন উহাদের বাহিরের নিয়মের দিকটাই প্রাধান্য পায় তখনই এক একটি অচলায়তন গড়িয়া ওঠে।/ চতুষ্পার্শে পর্ব্বত প্রমাণ কুসংস্কার এবং কুপ্রথার প্রাচীর সৃষ্ট হইতে থাকে। এই আবর্জ্জনার-অচলপুঞ্জ লইয়াই আচার বিলাসীরা এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, ইহারা যে ধর্ম্ম এবং সত্যের বিকাশ এবং প্রকাশের পথে বাধাস্বরূপ হইতেছে, তাহারা উপলব্ধি করিতেই পারে না। মানুষের সহজ সরল স্বাভাবিক সুন্দর আনন্দপূর্ণ পবিত্রভাবধারাও এই পঙ্কিলতার পেষণে আত্মপ্রকাশে বাধা পায়! পাপের গন্ধ পাওয়া মাত্র এই সকল সনাতনীর দল যেন আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন। পাপের শাস্তি বিধানে ইহারা এক অদ্ভুত বিকৃত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের একটা আঙ্গিকের দিক সৃষ্টি করিয়া তাঁহাতেই ইঁহারা মন প্রাণ নিয়োগ করেন। ধর্ম্মের আসল রূপ এবং পরিচয় ইহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে।

সকল কিছু সহজ সরল স্বাভাবিকতা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া এই সব আচারবিলাসীর দল সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া ক্রমাগত মিথ্যা এবং ভ্রান্তির পথে যাইতে থাকেন। শিশু সুভদ্র অচলায়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলিয়া মুক্ত আকাশ দেখিতে গিয়া যে হাস্যকর গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিল তাহাতে আপাত দৃষ্টিতে হয়তো অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া মনে হইতে

পারে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আজও কি আমাদের সমাজে এ ধরণের আচার বিলাসের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় না?

অবশ্য এই আচার বিলাসী সমাজের বুকেই আবার জন্মগ্রহণ ক'রে একজাতীয় লোক যাহারা সকল কিছু প্রথাকে ভাঙ্গিতে থাকে এবং কুসংস্কারকে খণ্ডন করিতে থাকে প্রতি পদে পদে। ইহারাই কবি, বিদ্রোহী এবং সঙ্গীতকার। অচলকে সচল করিবার ব্রতেই ইঁহারা দীক্ষা লইয়াছেন। পঞ্চক এই জাতীয় চরিত্রের প্রতীক। কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা এবং মিথ্যাতে যখন অচলায়তন পূর্ণ হইয়া ওঠে তখন আসেন গুরু তাঁহার অস্পৃশ্য য,নক, শোন-পাংশু প্রভৃতি সমাজের চক্ষে হীনজাতিদের লইয়া। ভাঙ্গিয়া দেন অচলায়তনের প্রাচীর সকল, খুলিয়া ফেলেন যতসব জানলা দরজা। সকল কিছুর ভিতর বহাইয়া দেন মুক্তির হাওয়া এবং আলো—ভরিয়া ওঠে দশদিশি স্বর্গীয় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়।

এই নাটকটিতে রূপক এবং সঙ্কেতের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সাধারণ গল্পটি রূপক—কিন্তু জায়গায় জায়গায় অতীন্দ্রিয়তার আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দাদাঠাকুর চরিত্রটি সাঙ্কেতিক; ইহা যেন একটি ভাব। ইঁহাকে অগ্রাহ্য করা যায় না, মিথ্যা দ্বারা প্রবঞ্চনা করা যায় না, বাধা দিয়া ঠেকানো যায় না।

পঞ্চক এবং মহা পঞ্চক একই সত্যের দুইটি দিক। অগ্রসর হইতে গেলে যেমন এক পা ফেলিয়া অন্য পা আগাইতে হয়, তেমনি সভ্যতা, ধর্ম্ম প্রভৃতির ক্ষেত্রেও স্থিতি এবং গতি, তাল ও লয়, নিষ্ঠা এবং বিদ্রোহ উভয়েরই প্রয়োজন। মহা পঞ্চক এবং পঞ্চক সহোদর ভাই। বিদ্রোহই একমাত্র সত্য নয়, নিয়মানুবর্ত্তীতারও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। ধ্বংসেই সার্থকতা আনে না—সঙ্গে সঙ্গে সংস্থিতিরও প্রয়োজন।

ডাকঘর

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে। "ডাকঘর" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাট্যগুলির অন্যতম। প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্যের বহু দেশেই বহুবার এই নাটকটি অভিনীত হইয়াছে এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু যে শাশ্বতভাবকে রূপায়িত করিয়াছে তাহার আবেদন সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে। পার্থিব জীবনে মানবাত্মা ক্রমাগত নানা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে থাকে—ইহাতে সে অস্থির হইয়া উঠে এবং ক্রমাগত মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়। অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় মৃত্যুরূপে এই মুক্তির আবির্ভাব হয়। সাধারণ লোকে মৃত্যুর বাহ্যিক ভয়াবহ রূপটাই দেখিতে শেখে—মৃত্যু যে মুক্তিদূত—মৃত্যুই যে ঈশ্বরের বারতালিপি বহন করিয়া আনে—সীমার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্য হইতে অসীমের ব্যাপ্তির মাঝে লইয়া যায় এসকল কথা তাহারা বোঝে না।

আগে "ডাকঘর" এবং "হানেলের" তুলনামূলক সমালোচনা করা হইয়াছে। উভয় নাটকেই প্রধান চরিত্র এক একটি শিশু। ইহার কারণ বোধহয় এই যে শিশু মনই সবচেয়ে নিষ্পাপ—ঐশ্বরিক মহিমা শিশুর কাছেই সহজে প্রতিভাত হয়। এই প্রসঙ্গে **Wordsworth**-এর **Ode on the Intimations of Immortality** কবিতাটির কথা মনে পড়িয়া যায়। তাছাড়া সকল দেশের বড় সাহিত্যিকই এ বিষয়ে একমত যে শিশুর মত না হইতে পারিলে ঈশ্বরকে জানা যায় না।

আবার আর একদিক দিয়া এ নাটকটির সহিত **Eugene O'neill** এর **Beyond the Horizon** নাটকেরও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

Beyond the Horizon নাটকেও নায়ক দিগন্তের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বাহির বিশ্বে ছুটিয়া যাইতে চায়—অমলও চায় নিজের সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতে। সে বলে—"কত বাঁকা বাঁকা ঝরণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব—দুপুর বেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।"

গল্পাংশ—মাধবদত্ত সংসারী লোক এবং ধনী। তাহার নিজের সন্তান নাই কিন্তু তবুও এতদিন দত্তক লয় নাই এই ভাবিয়া যে তাহার কষ্টার্জ্জিত ধন পরের ছেলে আসিয়া বিনা পরিশ্রমে নষ্ট করিতে থাকিবে। এমন সময়ে তাহার পরিবারে অসিল অমল। ছেলেটা তার স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো। ছোট বেলার থেকে বেচারার মা নেই—আবার সেদিন তার বাবাও মারা গেছে। ছেলেটি কিন্তু অসুস্থ। কবিরাজ তাকে খুব সাবধানে রাখিতে বলিয়াছেন। ওর বাইরে যাওয়া একেবারে বারণ। শরৎ কালের রৌদ্র আর বায়ু দুইই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ। নানা কড়া কড়া ঔষধ ওকে খাইতে হয়—কারণ কবিরাজের মতে রোগের সময় যত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তার ফলও তত বেশী পাওয়া যাইবে।

ঠাকুর্দ্দা ছেলে খেপাইবার সর্দ্দার। কবিরাজের মতে ঘরে বন্ধ না থাকিলে অমল বাঁচিবে না। আর ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই ঠাকুর্দ্দার বুড়ো বয়সের খেলা—এইজন্যই ঠাকুর্দ্দাকে মাধব ভয় পায়। ঠাকুর্দ্দা কিন্তু ঠিক করিয়া ফেলেন যে তিনি ছেলেটির সঙ্গে পরে আসিয়া ভাব করিয়া লইবেন।

অমল তাহার পিশেমশাই মাধব দত্তকে জিজ্ঞাসা করে, উঠোনটাতে যেখানে তাহার পিসীমা যাঁতা দিয়া ডাল ভাঙ্গেন, যেখাতে ভাঙ্গা ডালের

খুদগুলি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া লেজের উপর ভর করিয়া কাঠ বিড়ালী কুটুস্ কুটুস্ করিয়া খায়, সেখানে যাইতে তাহার বাধা আছে কিনা।

মাধব বলেন কবিরাজের মানা আছে—তাঁহাকে তো অবজ্ঞা করা যায় না। তিনি বড় বড় পুঁথি পড়িয়াছেন বলিয়াই সকল কিছুই জানিতে পারেন। বড় বড় পণ্ডিতেরাও কেহ ঘর হইতে বাহির হয় না—ঘরে বসিয়া কেবল পুঁথি পড়ে—আর কোনোদিকেই তাঁহাদের চোখ নাই। অমলও বড় হইয়া পুঁথি পড়িয়া পড়িয়া পণ্ডিত হইতে পারিবে।

অমলের কিন্তু এ ভাল লাগে না—সে পণ্ডিত হইতে চায় না। সে চায় ঘুরিয়া বেড়াইতে—নিজের চোখে সব কিছু দেখিতে। অমলের মনকে বাহিরের বিশ্ব টানিয়াছে। প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ আলো বাতাস প্রভৃতি সকল সৌন্দর্য্য সম্ভার তাহাকে নিয়ত আকর্ষণ করে বাহিরে চলিয়া আসিতে। জানালার কাছে বসিয়া দূরে সে পাহাড় দেখিতে পায়—তাহার ইচ্ছা হয় পাহাড়টা পার হইয়া চলিয়া যাইতে। মাধব মনে করে পাহাড় যখন বেড়ার মত রয়েছে তখন ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ। অমল বলে—"আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানালার ধারে বসে ঐ ডাক শুনতে পায়।"

বাহিরে লোক যাইতে দেখিলেই অমলেরও ইচ্ছা করে তাহাদের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে। ঘরে বসিয়া বসিয়া তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মানবাত্মাও যেন এমনি করিয়াই আকুল হইয়া উঠে—ইঙ্গিতে এই কথাই কবি বলিতে চাহিয়াছেন।

বিদেশী লোক দেখিলেই অমলের ভাল লাগে। কারণ তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে অপরিচয়ের রহস্য, অজানা দেশের পরিচয়।

দইওয়ালা জানালার কাছের রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যায়—"দই—দই—ভালো দই।" এ ডাক অমলকে উদাস করিয়া দেয়। সে দইওয়ালাকে ডাকিয়া ভাব জমায়, তাহাদের গ্রামের খবর শোনে—যে গ্রাম পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়—শ্যামলী নদীর ধারে। কল্পনায় সেখানকার সকল কিছু যেন অমলের চোখের সাম্‌নে প্রতিভাত হইয়া উঠে। তার ইচ্ছা হয় সেও দই বেচিতে শিখিবে। সুর করিয়া হাঁকিতে থাকিবে দই, দই, দই,—ভালো দই। কত গ্রামের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, কত জিনিষ দেখিবে।

রাস্তায় যে প্রহরী পায়চারী করিয়া বেড়ায় তাহাকেও ডাকিয়া অমল আলাপ জমায়। প্রহরী যে ঘণ্টা বাজায় ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং তাহা শুনিতে অমলের ভারি ভাল লাগে। ঘণ্টা কেন বাজায় জানিতে চাহিলে প্রহরী বলে—ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, 'সময় বসে নেই, সময় কেবলি চলে যাচ্ছে, কোন্‌ দেশে তা কেউ জানে না।' অমলের ইচ্ছা সে ও সময়ের সঙ্গে সেই দেশে চলিয়া যাইবে। প্রহরীর কাছ হইতেই অমল জানিতে পারে যে রাস্তার ওপারের বড় বাড়িতে যেখানে নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যেখানে ক্রমাগত লোকজন যাতায়াত করিতেছে তাহাই রাজার নূতন ডাকঘর। প্রহরীর কাছ হইতে অমল শোনে যে ছেলে মানুষদের রাজা ছোট ছোট চিঠি দেন এবং সে ও একদিন রাজার চিঠি পাইবে।

অমল ঠিক করে বড় হইলে সে রাজার ডাক-হরকরা হইবে—কত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইবে—দেশে, দেশে, ঘরে ঘরে। রোদ নাই, বৃষ্টি নাই, গরীব বড়লোকের তফাৎ নাই—সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করিয়া চলিতে হইবে। দূর হইতে মোড়লকে আসিতে দেখিয়া প্রহরী

পলায়ন করে। কারণ মোড়ল ইহাদের গল্প করিতে দেখিলে বিপদ বাধাইবে। সকলের সঙ্গে বিবাদ করিয়াই মোড়ল ব্যবসা চালায়।

অমল মোড়লকে ডাক দেয়। প্রহরীর কাছ হইতে সে শুনিয়াছে মোড়লের কথা না শুনিয়া কাহারও পরিত্রাণ নাই, সুতরাং সে মোড়লকে অনুরোধ করে,—ডাক হরকরাকে বলিয়া দিতে যে তাহারই নাম অমল—রাজার চিঠি আসিলে তাহাকে এইখানে পাওয়া যাইবে। এ লইয়া মোড়ল অনেক উপহাস করে—অমল অতশত বোঝে না—সে ভাবে মোড়ল বুঝি রাগ করিয়াছে—একটু ভয়ও পাইয়া যায়।

সংসারেও এমনিই ঘটিয়া থাকে। সবজান্তা মোড়লের দল ভাবে জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা বুঝিবার বা জানিবার ক্ষমতা এবং অধিকার একমাত্র তাহাদেরই। মোড়লের প্রস্থানের পর প্রবেশ করে সুধা। সুধা মালিনীর মেয়ে—ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথে। সুধা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় যে, ফুল তুলে ফেরবার পথে অমলকে একটি ফুল দিয়ে যাবে। ঠিক হয়, অমল বড় হলে পর তাকে দাম দিবে। অমল জিজ্ঞাসা করে—"আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?"

সুধা বলে—"না, ভুলব না, দেখো, মনে থাকবে।" এ নাটকে সুধার কথাগুলিই সবচেয়ে বেশী মনকে টানে। তাহার মধ্যে তত্ত্ব বা সঙ্কেতের কোনো গুরুত্ব বা গাম্ভীর্য্য নাই—যাহা আছে তাহা অতি সহজ সুন্দর স্বাভাবিক মানবতার ভাব—সুধাই যেন ডাকঘর নাটকটির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। ইহাকে সঙ্কেত-সর্ব্বস্ব হইতে দেয় নাই।

সুধার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে ছেলের দল। ইহারা বাহিরে খেলা করিতে চলিয়াছে—সকলেই খুসীতে ভরা, সকলেই প্রাণে ভরপুর। অমল ইহাদের জানালার কাছে দাঁড়াইতে বলিলে, ছেলেরা তাহাকেও বাহিরে আসিয়া খেলার সাথী হইতে আহ্বান করে। কিন্তু

অমলের তো বাহিরে যাইবার উপায় নাই। কবিরাজের যে মানা আছে।

অমল অনেক খেলনা আনিয়া ছেলেদের দেয়। তারাও খুশী হইয়া অমলের ঘরের সামনে খেলা সুরু করে। অমলের কিন্তু ঘুম পাইতে থাকে। ছেলেরা ডাক-হরকরাদের চেনে জানিয়া অমল তাহাদের অনুরোধ করে পরের দিন সকালে এখান দিয়া যাইবার সময় যেন একজন ডাকহরকরাকে উহারা সঙ্গে করিয়া আনে। রাজার চিঠির জন্য সে এত ব্যস্ত যে পাছে চিঠি আসিলে তাহার কাছে ঠিকমত বিলি না হয় এই ভয়েই সে অস্থির। খেলা সাঙ্গ করিয়া ছেলের দল প্রস্থান করে।

এরপর দেখা যায় অমল রোগে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। কবিরাজ তাহাকে জানালার কাছেও যাইতে বারণ করিয়া গিয়াছেন। অমলের মহা চিন্তা যে ফকির তাহাকে জানালার কাছে না দেখিয়া চলিয়া যাইবেন। ঠাকুর্দাই ফকিররূপে অমলের সহিত পরিচয় করিয়াছেন। প্রতিদিন আসিয়া অমলকে তিনি নানা দেশ-বিদেশের গল্প বলেন। এইবার ফকিরবেশে ঠাকুর্দা প্রবেশ করেন। তিনি ক্রৌঞ্চদ্বীপের গল্প সুরু করেন। সে ভারি আশ্চর্য্য জায়গা। সে পাখীদের দেশ—সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে—সে দেশ সমুদ্রের ধারে। সেখানে সব নীল রঙের পাহাড়। সন্ধ্যার সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্য্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখী তাদের বাসায় ফিরে আস্‌তে থাকে—সেই আকাশের রঙে, পাখীর রঙে আর পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে। সেখানকার ঝরণা একেবারে হীরে গালিয়ে তৈরী।

অমল ফকিরকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করে—ডাকঘরে তাহার

নামে রাজার চিঠি আসিয়াছে কিনা। ফকির জানান চিঠি রওনা হইয়াছে—এখন পথে আছে।

অমলের মনে হয় সে যন সব কিছু চোখের সামনে দেখিতে পায়। সে ঠাকুর্দ্দাকে বলে "আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলি নেমে আস্‌ছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কতদিন কত রাত ধ'রে সে কেবলি নেমে আস্‌ছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে, সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধ'রে সে কেবলি চলে আস্‌ছে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত, তারই সরু গুলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলি আস্‌ছে, তার পরে আখের ক্ষেত, সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল্ চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি আস্‌ছে, রাতদিন একলাটি চলে আস্‌ছে। ক্ষেতের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাক্‌ছে, নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদা খোঁচা ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমস্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। যতই সে আস্‌ছে দেখ্‌ছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশী হয়ে হয়ে উঠ্‌ছে"।

এ দৃষ্টি, এ কল্পনাশক্তির জন্য যে নবীনতার প্রয়োজন তা ঠাকুর্দ্দার নাই তবু অমলের দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর্দ্দাও যেন দেখিতে পান। অমলের ইচ্ছা সে রাজার কাছে ভিক্ষা চাহিবে তাহাকে তাঁহার ডাক হরকরা করিয়া দিতে। সে লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইবে। বস্তুতঃ এই আকাঙ্খাই তো মানবাত্মার একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। রাজা বা ঈশ্বরের বার্ত্তাবহরূপে নানা রূপ Message লইয়া ঘরে ঘরে তাহা পৌছাইয়া দেওয়া। সকল দেশের বড় বড় মহাত্মাই—যেমন আর্য্যঋষিগণ, বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট প্রভৃতি তো এই কাজই শ্রেষ্ঠ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

ঠাকুর্দ্দা অমলকে জিজ্ঞাসা করেন—"বাবা! ঘরে বসে থাক্‌লেই বা এত কিসের দুঃখ।"

অমল উত্তর দেয়—"না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিলো, আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভাল লাগে। একদিন আমার চিঠি এসে পৌছবে, সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি।"

ক্রমে অমল যেন অরো আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার শরীরে আর কোন বেদনা নাই। কবিরাজ কিন্তু ইহাতে ভয় পাইয়া গেলেন। বুঝিলেন—আর ধরিয়া রাখা যাইবে না। কবিরাজের ধারণা বাহিরের হাওয়া লাগিয়াই অমলের অবস্থা খারাপের দিকে গিয়াছে। মাধবকে উপদেশ দিলেন, সদর দরজার তালা চাবি বন্ধ করিয়া দিতে। যে জানালা দিয়া সূর্য্যাস্তের আভা আসে—তাহাও বন্ধ করিতে হইবে। মোড়ল আসিতেছে দেখিয়া কবিরাজ বলিলেন, বাড়ী গিয়া বিষ বড়ি পাঠাইয়া দিবেন—বাঁচিবার হইলে উহাতেই বাঁচিবে—এবং প্রস্থান করিলেন।

মোড়ল প্রবেশ করিল এবং অমলকে উপহাস করিয়া জানাইল যে তাহার কাছে রাজার চিঠি আসিয়াছে। অমল চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসাকরিল—"সত্যি"?

মোড়ল তাহাকে একখানা সাদা কাগজ দিয়া বলিল এই রাজার চিঠি। তারপর সে হা হা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমল বুঝিতে পারিল না মোড়ল ঠাট্টা করিতেছে কিনা—ঠাকুরদাকে জিজ্ঞাসা করিল এ সত্যিই রাজার চিঠি কিনা।

ঠাকুরদা জোর দিয়া বলিলেন ইহাই রাজার চিঠি। অমল মোড়লের কাছে চিঠিতে কি লেখা আছে জানিতে চাহিল। মোড়ল

আবার উপহাস করিয়া বলিল—রাজা দুই একদিনের মধ্যেই আসিতেছেন। তাঁহার জন্য মুড়ি মুড়কির ভোগ করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছেন।

মাধব দত্ত এ সকল কথায় ক্রমাগত ভয় পাইতে লাগিল এবং হাত জোড় করিয়া মোড়লকে অনুরোধ করিল পরিহাস বন্ধ করিতে। ঠাকুরদা মাধবকে থামাইয়া দিয়া বলিলেল—পরিহাস করেন, এমন সাধ্য আছে ওঁর?.........রাজা স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন—রাজ-কবিরাজকেও সঙ্গে করে আন্‌ছেন।

অমল যেন দূরে রাজার আগমনের বাজনা শুনিতে লাগিল। সে মোড়লকে বলিল—আমি মনে করতুম তুমি আমার উপর রাগ করেছ—আমাকে ভালবাস না। তুমি যে সত্যিই রাজার চিঠি আন্‌বে এ আমি মনে করিনি।

এরপর দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। মাধব ও মোড়ল মনে করিল বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে। কিন্তু প্রবেশ করিল রাজদূত। সে ঘোষণা করিল—মহারাজ দুই প্রহর রাত্রে অমলকে দেখিতে আসিবেন। আর তিনি তাঁহার সকলের চেয়ে বড় কবিরাজকে পাঠাইয়াছেন এই বালক বন্ধুটিকে দেখিবার জন্য। এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিলেন রাজ-কবিরাজ। তিনি আসিয়াই চারিদিকের দরজা জানলা সব খুলিয়া দিলেন। অমল যেন নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। রাজ-কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেমন বোধ করিতেছে—অর্ধরাত্রে রাজা আসিলে সে তাঁহার সহিত বাহির হইতে পরিবে কিনা!

অমল জানাইল তাহার আর কোনো বেদনা বা অসুখ নাই এবং বাহির হইতে পারিলেই সে বাঁচে। অমলের এই বাহিরে যাইবার ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের 'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী'

গানটির কথাই বার বার স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজবৈদ্য মাধবকে নির্দেশ দেন রাজার আগমনের জন্য ঘরটি ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখিতে এবং মোড়লকে ঐ স্থান হইতে সরাইয়া দিতে। অমল বাধা দিয়া বলে—"উনি আমার বন্ধু। তোমরা যখন আসনি, উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন।" অতএব মোড়ল রহিয়া গেলেন। মাধব বিষয়ী লোক—সে অমলকে উপদেশ দেয় রাজা আসিলে তাঁহার কাছে হইতে কিছু প্রার্থনা করিয়া লইতে। অমলের কথায় সে হতাশ হইয়া পড়ে। অমল বলে সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে রাজাকে বলিবে তাহাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করিয়া দিতে—দেশে দেশে ঘরে ঘরে সে রাজার চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইবে।

অমলের ঘুম আসিয়া পড়ে। প্রদীপের আলো নিবাইয়া দেওয়া হয়। সকলে স্তব্ধ হইয়া যান। এমন সময় প্রবেশ করে সুধা। রাজ-কবিরাজ ওকে জানান যে অমল নিদ্রিত। সুধা ওর জন্য ফুল রাখিয়া যায় এবং উহাদের বলে যে অমল জাগিলে জানাইতে যে সুধা তাহাকে ভুলিয়া যায় নাই। ইঙ্গিতে ইহাই বুঝান হইয়াছে যে অমল চলিয়া যাইবে বটে তবে সে প্রেমের স্মৃতির মধ্যেই বাঁচিয়া থাকিবে।

"ডাকঘর" পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটক। স্পষ্ট আখ্যানভাগ এবং গুপ্ত আখ্যানভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। বাচ্যার্থ ব্যঙ্গার্থের দ্বারাই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে—মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে।

এ নাটকে অমলের চরিত্রে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের নিঃসঙ্গ রুদ্ধ জীবনের ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। এ মতকে অগ্রাহ্য করিবার কোনো হেতু নাই।

আরও একটি সত্যকে রবীন্দ্রনাথ ভারি সুন্দরভাবে আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অতি পরিচয়ের জন্য আমাদের

আশে পাশের অনেক জিনিসেরই সত্যকার সুন্দর স্বরূপ আমাদের নজরে আসে না। ঐ গুলিকে হারাইলে পরই উহাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারি। বাহির বিশ্ব হইতে সরাইয়া আনিয়া যখন অমলকে ঘরে বন্দী করা হইল তখন বাহিরের অতি সামান্য সামান্য বস্তু এবং প্রাণীর মধ্যেও সে দেখিতে লাগিল কত রহস্য আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যের উপাদান।

সি, এফ্‌ এণ্ড্রুজকে রবীন্দ্রনাথ এই নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"Amal represents the man whose soul has received the call of the open road—he seeks freedom from the comfortable enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable. But Madhab, the worldly wise, considers his restlessness to be the sign of a fatal malady; and his adviser, the physician, the custodian of conventional platitudes—with his quotations from prescribed text-books full of maxims—gravely nods his head and says that freedom is unsafe and every care should be taken to keep the sick man within walls. And so the precaution is taken.

But there is the Post office in front of his window, and Amal waits for the king's letter to come to him direct from the King, bringing to him the message of emancipation. At last the closed gate is opened by the King's own physician, and that which is death' to the world of hoarded wealth and certified creeds brings him awakening in the world of spirltual freedom."

(Letters to A Friend)

'ডাকঘর' সম্বন্ধে কবি ইয়েটস্ বলিয়াছেন—

When this little play was performed in London......., some friends of mine discovered much detailed allegory, the Headman being one principle of social life, the Curdseller or the Gaffer another; but the meaning is less intellectual, more emotional and simple. The deliverance sought and won by the dying child is the same deliverance which rose before his imagination, Mr. Tagore has said, when once in the early dawn he heard amid the noise of a crowd returning from some festival, this line out of an old village song, "Ferryman, take me to the other shore of the river." It may come at any moment, though the child discovers it in death, for it always comes at the moment when the "I" seeking no longer for gains that canuot be "assimilated with its spirits" is able to say, "All my work is thine."

———

ফাল্গুনী

ইহা বসন্তোৎসবের নাটক। রচনার কাল ১৩২১ সাল। 'ফাল্গুনী'তে যাহা বৃক্ষাকার এবং সহজ বিস্তৃতিতে বলা হইয়াছে তাহাই বীজরূপে এবং বিবিক্তরূপে 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতায় দেওয়া আছে। 'ফাল্গুনী'তে রূপকের প্রাধান্য—স্পষ্টার্থ এবং ব্যঙ্গার্থকে বেশ সহজেই বিযুক্ত করা যায়। কি মানস রাজ্যে, কি প্রকৃতির বুকে যৌবন কখনও নষ্ট হইয়া যায় না। দৈহিক দিকটাই মানুষের জীবনের বড় কথা নয়—মানসিক দিকটা আরও অনেক উপরে। দেহের যৌবন নষ্ট হয় কিন্তু মনের যৌবন চিরতরে নষ্ট হইতে পারে না—ফিরিয়া ফিরিয়া আসে।

এই নাটকের সূচনায় রাজা যখন পাকা চুল দেখিয়া ভয় পাইয়া ভাবিলেন—যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করার চেষ্টা—

কবি উত্তর দিলেন—কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ওই সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রঙ লাগাবে।

রাজা—কই, রঙের আভাস তো দেখিনে।

কবি—সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

রাজা—চুপ, চুপ, চুপ করো, কবি, চুপ করো।

কবি—এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আর এক যৌবন-লক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

প্রকৃতির বুকেও এই তথ্যটিই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ যৌবন নষ্ট হইবার নহে। শীতের বাহিরের বুড়া রূপটা একটা ছদ্মবেশ মাত্র। এই ছদ্মবেশের অন্তরে রহিয়াছে বসন্তের চির নবীনতা।

'বলাকা'র মূল সুরের সঙ্গে 'ফাল্গুনী'র যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 'বলাকা'য় কবি গতিবেগের জয়গান গাহিয়াছেন। এই নাটকেও ইঙ্গিতে ইসারায় বুঝাইয়াছেন যে যাহা গতিময় তাহাই প্রাণবন্ত। যাহা স্থানু তাহাই প্রাণহীন এবং মৃত। কি মানুষের জীবনে, কি প্রকৃতির মধ্যে, কি বস্তুরাজ্যে, সর্ব্বত্র এই গতিবেগই যৌবনের প্রাণময়তার এবং বসন্তের কারণ।

বাউল চরিত্রটি সাঙ্কেতিক শিল্পের দিক দিয়া একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে কথা বলে কম, কিন্তু নীরবতাই তাহাকে রহস্যময় এবং ভাব গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। সে দৃষ্টি শক্তিহীন, কিন্তু সেই জন্যই তাহার অন্তর্দৃষ্টি রহিয়াছে। সে বলে "আমি যে সব দিয়ে শুনি, শুধু কান দিয়ে না।" অন্ধকারকে সে ভয় করে না—কারণ আঁধারের স্তরে স্তরে যে আলোক বিরাজমান তাহা তাহার কাছে সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট। যৌবনের দলের সেই পথ প্রদর্শক।

"ফাল্গুনী" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে। পাড়া জুড়াইয়াছে। ইহাদেরই বসন্ত যাপনের কাহিনী কবি লিখিতেছেন। লেখাটা নাট্য কিনা তাহা স্থির হয় নাই, ইহা রূপক কিনা তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর যাই হউক, ইহা ইতিহাস নহে। ইহার সত্য মিথ্যার জন্য মূলে তিনিই দায়ী যিনি জগতে বসন্তের মতো এতবড় প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন।

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানারকমের আছে। কারও কারও চুল পাকিয়াছে, কিন্তু সে খবরটা এখনো তাদের মনের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনও বাহিরের

হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য সে সবচেয়ে প্রবীন। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।

ইহারা যাকে সর্দ্দার বলিয়া ডাকে, সর্দার ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোনো একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যকারই সর্দার। এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া, পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না, ভিতরে কথা কয়, লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।

এই কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করা দরকার নাই। যে-দলের কথা বলিয়াছি কোনো তালিকায় তাহাদের জনসংখ্যা এ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য তাহাদের সংখ্যার কোনো পরিচয় দেওয়া গেল না। আর, দলের কে যে কোন্ কথাটা বলিতেছে তারও নিদর্শন রাখিলাম না। যে যেটা খুশি বলিতে পারে। কেবল উহাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে, তাদেরই কথাগুলোর সঙ্গে তাদের নামের যোগ থাকিবে।

নক্ষত্রলোকের যে-কবি নীহারিকার কাব্য লেখেন, তিনি আপন খেয়াল মতো অনেকখানি আলো ঝাপ্‌সা করিয়া আঁকিয়াছেন। তারই মাঝে মাঝে একটা-একটা তারা ফুটিয়া ওঠে। বেশ দেখা যাইতেছে এই মতের লেখকটা তাঁরই নকল করিবার চেষ্টা করে। আলোর নকল কতটা করিতে পারে জানিনা, কিন্তু ঝাপসা নকল করিতে

চমৎকার হাত পাকাইয়াছে। খুব বড়ো দুরবীণ এবং খুব জোড়ালো অনুবীক্ষণ লাগাইয়াও ইহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর, অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।

যতো বড় লেখা তার চেয়ে ভূমিকা বড়ো হইলে লোকের সুবিধা হয়, এমন-কি, ভূমিকাটাই রাখিয়া লেখাটা বাদ দিতে পারিলেও কোনো উৎপাত থাকে না। কিন্তু, ফাল্গুন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সময় আর বেশী নাই।

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবুও সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান; অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিন রাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চির নবীনতার নিঃশেষ হল না। Facts এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্ত্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্ত্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয় পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সাম্‌নের দিকে থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তাহলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত; এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধ্বসে যেত।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চির পুরাতন এই যে চির নূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে।

প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, 'ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করিনে—আচ্ছা, দেখ্, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর্।' প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাক্‌লে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।

মুক্তধারা ও রক্তকরবী

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের (1914—1918) পর 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটক দুইটি রচিত হয়। যান্ত্রিক-সভ্যতা, ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং বিকৃত জাতীয়তাবোধ যে মানুষকে পাশবিকতার কতোটা নিম্নস্তরে লইয়া যাইতে পারে তাহা কবি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন যুদ্ধোত্তর কালের বিভিন্নদেশ এবং রাষ্ট্রের আচার ব্যবহার আচরণ দর্শনে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেন নরকাগ্নি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, চারিদিকে দারুণ দুর্য্যোগ, দুঃসহ নির্য্যাতন। ধনিক চাহিতেছে শ্রমিককে সর্ব্বপ্রকার নিপীড়ন উৎপীড়নের দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে, এক রাষ্ট্র চায় অন্য রাষ্ট্রের ধ্বংসের দ্বারা নিজের পাশবিক শক্তির গড়িমা বৃদ্ধি করিতে।

আর সকলের উপরে আছে যন্ত্ররাজ। যান্ত্রিক সভ্যতার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে মানুষের ধর্ম্ম, মর্ম্ম, হৃদয়, আত্মা সকলই নষ্ট হইতে বসিয়াছে। চারিদিকে এই 'বিকৃতির কদর্য্য বিদ্রূপ' এবং 'আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা' দেখিয়া কবি এ সকলের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন এবং তাহারই ফলে রচিত হইল এই দুইটি অতুলনীয় নাটক 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'।

মুক্তধারা

১৩২৮ সালে পৌষমাসে রচিত। উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই বশে আনিতে না পারিয়া যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়া শিবতরাই রাজ্যের জল সরবরাহের পথ বন্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বিভূতির বিশ্বাস যন্ত্রের জোরে সে নিজেই দেবতার পদ গ্রহণ করিবে। বহু বৎসরের চেষ্টায় এক অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের বাঁধ তৈয়ারী করিয়া সে মুক্তধারা ঝরণাকে বাঁধিয়া ফেলিল। শিবতরাইয়ের জল পাইবার পথ বন্ধ হইল। পূর্ব্ব হইতেই শিবতরাইয়ের প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিয়াছে। দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাব হওয়াতে তাহারা খাজনা দিতে পারিতেছে না। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা যুবরাজ অভিজিৎকে পাঠাইয়াছেন ওখানকার প্রজাদের বশে আনিতে। অভিজিৎ উদার, জাতীয়তাবোধশূন্য—ক্ষুদ্র স্বার্থবোধাদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সকল মানুষই তাঁহার কাছে সমান প্রিয়। প্রেমের দ্বারা অতি সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রজাদের অন্তর জয় করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। শিবতরাইয়ের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি

নন্দী সংকটের গড় দিলেন ভাঙ্গিয়া। ইহাতে উত্তরকূটের স্বার্থে ঘা লাগিল এবং সেখানকার লোকেরা উঠিল খেপিয়া। এমন সময়েই বিভূতির বাঁধযন্ত্র সম্পূর্ণ হইল এবং উত্তরকূটের দল পৈশাচিক প্রতি-হিংসার সার্থকতার সম্ভাবনায় আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

এদিকে যুবরাজ অভিজিতের বিরুদ্ধে উত্তরকূটের প্রজারা আন্দোলন করিয়া তাঁহাকে শিবতরাইয়ের শাসনভার ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য করিল। তাঁহার স্থানে কার্য্যভার গ্রহণ করিল রাজশ্যালক। নূতন শাসনকর্ত্তার অত্যাচার শিবতরাইয়ের প্রজাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এর উপর আবার দেখা দিল দুর্ভিক্ষ—শিবতরাইয়ের এই চরম দুর্দ্দশার দিনে তাহাদের জল বন্ধ করিয়া দিবার যন্ত্র সৃষ্টি হওয়াতে উত্তরকূটের দল উল্লসিত হইয়া উঠিল—এবার শিবতরাইকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যাইবে—দেখা যাক্ আর কতদিন শিবতরাই বশ্যতা না মানিয়া পারে।

এই বাঁধ তৈয়ারী করিতে কত লোকের কত শ্রম করিতে হইয়াছে কত দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ বরণ করিতে হইয়াছে, কতজনের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে হইয়াছে। এই সব অত্যাচারের স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে সন্তানহারা জননী অম্বার বক্ষফাটা ক্রন্দনধ্বনির ভিতর দিয়া—"সুমন, আমার সুমন........ ..." এবং পাগলা বটুকের সাবধান-বাণী 'সাবধান বাবা, যেওনা ওপথে······বলি দেবে······নরবলি প্রভৃতি কথার ভিতর দিয়া।

অভিজিৎ রাজার খুড়ার কাছ হইতে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি এই রাজবংশের কেহ নহেন। মুক্তধারার নিকটে শৈশবে তাঁহাকে কুড়াইয়া পাইয়া রাজা রণজিৎ পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। একথা শুনিয়া যেন তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভাগ্যদেবতা বিশেষভাবে কাহারোও সহিত যুক্ত থাকিবার জন্য তাঁহাকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সকলেরই আত্মীয়, সকলেরই

পরম বন্ধু। কোনো বিশেষ ঘরের, বিশেষ জাতির বা বিশেষ দেশের সঙ্গে তাঁহার যোগ নাই। তাই উত্তরকূটের যুবরাজ হইয়াও শিবতরাইয়ের সর্ব্বনাশে তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছেন; উত্তরকূটের অত্যাচার নিবারণ করিতে চাহিয়াছেন, যন্ত্ররাজ বিভূতিকে শিবতরাইয়ের সর্ব্বনাশ সাধন না করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু উত্তরকূটবাসীরা ও বিভূতি মনে করে বিজ্ঞানের দ্বারা তাহারা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া যাইবে—যন্ত্রের সাহায্যে সকল কিছু বাধাকে ধ্বংস করিবে। এই ধরণের মানুষদের—অর্থাৎ যাহারা মনে করে যন্ত্রের কৃপায় তাহারা দেবতা হইয়া বসিবে—সম্বন্ধে Aldous Huxley লিখিয়াছেন :—

"drest in a little brief authority,
most ignorant of what he's most assured
His glassy essence—like an angry ape
plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep."

[Ape and Essence : Aldous Huxley.

উত্তরকূটের প্রজারা চায় অভিজিৎকে শাস্তি দিতে। রাজার আদেশে অভিজিৎ বন্দী হইলেন। বন্দীশালায় আগুন লাগিলে খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ যুবরাজকে উদ্ধার করিয়া নিজের রাজধানী মোহনগড়ে লইয়া যাইতে চাহিলে অভিজিৎ সম্মত হইলেন না।

এদিকে প্রজারা যুবরাজ বন্দীশালায় নাই শুনিয়া চারিদিকে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি—হঠাৎ সকল স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মুক্তধারার মুক্ত জলস্রোতের গর্জ্জনের শব্দ পাওয়া গেল।

কুমার সঞ্জয় বার্ত্তা বহন করিয়া আনিলেন। যন্ত্ররাজ বিভূতির যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন নিজে যুবরাজ

অভিজিৎ। যন্ত্রও প্রতিশোধ নিয়াছে—স্রোতের মুখে পড়িয়া তিনি আহত হইয়াছেন এবং মুক্তধারা "তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।"

এই নাটকটিতে রূপক এবং সঙ্কেতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। রাষ্ট্র-নীতি, জাতীয় রাষ্ট্রের নীচ শিক্ষাপদ্ধতি, যান্ত্রিকতা, জাতীয়তা প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে কবির নিজস্ব মতামত অতি সুন্দরভাবে 'মুক্তধারা'য় বিবৃত হইয়াছে। কবি চিরদিন শক্তের অত্যাচার, ধনতন্ত্র, বিজ্ঞানের বিকৃত ব্যবহার, বিকৃত দাস্য-মনোভাব-পূর্ণ শিক্ষাধারা প্রভৃতিকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিতেন। এই সকল পরিবেশের মধ্যে আত্মার সহজ সুন্দর এবং পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। এই সত্যের প্রতিই 'মুক্তধারা'য় জোর দেওয়া হইয়াছে। আর সকল কিছুর মূলে রহিয়াছে মুক্তির ছন্দস্রোতের প্রতি ইঙ্গিত। কি বস্তুজগতে, কি মানসরাজ্যে যে মুক্তধারা স্বাভাবিক নিয়মে বহিয়া চলিয়াছে তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে যাওয়ার অর্থ আত্মার বিনাশ ডাকিয়া আনা, ঈশ্বরের সৃষ্ট নিয়ম কানুনের রাজ্যে মানুষের কৃত আইন আরোপের বাতুল প্রয়াস। এই মূল সুরটি সাঙ্কেতিক। ধনঞ্জয় এবং অভিজিতের চরিত্র সাঙ্কেতিকতায় মণ্ডিত বলিয়াই এত হৃদয়গ্রাহী এবং মর্ম্মস্পর্শী। অভিজিৎ সুদূরের পিয়াসী—গণ্ডীকে বর্জ্জন করিয়া সে বিরাটত্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে ব্যাকুল। মুক্তধারার মুক্তস্রোতের মতই তাঁহার আত্মাও মুক্ত আত্মা। ধনঞ্জয়ের ভিতর জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়।

রক্তকরবী

এই নাটকটি ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৩ সালে পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে। প্রবাসীতে বাহির হইবার আগে ১৩৩০ সালে ইহা শিলংএ প্রথম রচিত হয় এবং তখন কবি ইহার নাম দিয়াছিলেন 'যক্ষপুরী'।

পাশ্চাত্যের ধনিক সম্প্রদায় পরিচালিত যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব, জড়বাদ, বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার প্রভৃতি ক্রমাগত মানুষকে যে কিভাবে পশুত্বের স্তরে লইয়া যাইতেছে, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাহারই স্বরূপকে কবি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এই নাটকটিতে। একালের আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততায় পৃথিবী আজ সর্ব্বনাশের পথে, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব আজ পদে পদে খর্ব্ব। সে আজ আত্মবিস্মৃত, নির্জ্জীব, বিশেষত্ব বর্জ্জিত, সমাজের যন্ত্রবিশেষ। তাহার আজ নিজস্ব দিবার মত কোনও পরিচয় নাই—সত্তা নাই—প্রাণশক্তি নাই। সে আজ ব্যক্তি বিশেষ নয়—তাহার পরিচয় গোষ্ঠির ভিতর দিয়া, দলগতভাবে বা জাতির মধ্য দিয়া। ব্যক্তি হিসাবে সে ৪৭ ক বা ২৬৯ ফ মাত্র। তাহার বাসস্থানও দন্ত্য-ন বা মূর্দ্ধন্য-ণ পাড়ায়।

মনুষ্যত্ব এবং মানবতার এই নিপীড়ন ও অপমানের ফলও ফলিতে সুরু করিয়াছে। ধন ও শক্তির লোভে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি হারাইতে বসিয়াছে। জীবন হইতে প্রেম ও সৌন্দর্য্য, ছন্দ ও গান, রঙ্ ও রস ক্রমাগত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সহজ যোগ দূর হইয়া শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে। বিশ্বনিয়ন্তার বংশীধ্বনিতে যে সুরলহরীর সৃষ্টি হয়,

নটরাজের নৃত্যের তালে তালে যে ছন্দস্রোতের ধারা বহিতে থাকে তাহাই ত প্রতিক্ষণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে বস্তুবিশ্বের অন্তরে অন্তরে, মানবের মানসরাজ্যে এবং প্রকৃতির রূপে, বর্ণে, শব্দে, গন্ধে, গানে, আলোকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হওয়া উচিত—একের অন্তরের ছন্দের সহিত অন্যের অন্তরের ছন্দের নিবিড় মিলনে। তেমনি জড়বস্তুর ব্যহ্যিক রূপের মোহে আকর্ষিত না হইয়া উহার অন্তরস্থিত ছান্দিক রূপটাকেই উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রকৃতির সহিত আন্তরিক ছন্দের বন্ধন স্থাপন করিতে পারিলেই প্রকৃতির সহিত সহজ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। এই প্রেমের সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই হইবে মিলনের সার্থকতা—প্রাণের সহিত প্রাণের যোগ—আত্মার সহিত আত্মার সম্প্রীতি।

সুখসম্পদের সামঞ্জস্য পূর্ণ বণ্টনের নিমিত্তই একদিন ধন ও অর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, অর্থাৎ অন্যান্য পদার্থের সহজ এবং সুন্দর আদান প্রদানের নিমিত্ত বা উপায় স্বরূপই অর্থের উৎপত্তি। বর্ত্তমান জগতে অর্থ উদ্ভাবনের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া আমরা অর্থ হিসাবেই অর্থকে ভালবাসি। ইহার ফলেই জন্মলাভ করিয়াছে ধনতন্ত্রবাদ এবং এই কারণেই দেখা দিয়াছে দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার। প্রেমের দ্বারা নিজেকে সংহত করিবার মধ্যেই শক্তির সার্থকতা। কিন্তু আজিকার জগতে প্রেম এবং শক্তি যেন বিপরীত-মুখী এবং পরস্পরবিরোধী। ফলে দেখা দিয়াছে শক্তির অপব্যবহার—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং নিপীড়ন।

এইভাবে জীবন হইতে সহজ সরল স্বাভাবিক বৃত্তি গুলিকে বর্জ্জন করিয়া মানুষ আজ কতকগুলি অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেই পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। নিজের চিন্ময় দিকটাকে উপেক্ষা এবং অগ্রাহ্য করিয়া মৃন্ময় অংশটিকেই প্রধান করিয়াছে। ইঙ্গিতে এই

সকল তথ্যই 'রক্তকরবী' নাটকটিতে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা, শক্তি ও প্রেমের মিলনের মধ্য দিয়াই চরম সৌন্দর্য্য এবং আনন্দকে লাভ করা যায়—চরমতমের সহিত পরিচয়ঘটিয়া থাকে। যাহার মধ্যে এ সকল গুণের সমাবেশ নাই সেই তো প্রকৃত মৃত। সেই কারণেই আজিকার পৃথিবীতে এই হিসাবে প্রাণশক্তির এত অভাব। যান্ত্রিকতার প্রভাবে আজ মানুষ অতিশয় ক্লান্ত, নির্জীব এবং প্রাণশূন্য। তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষমতা পর্য্যন্ত যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। যন্ত্র এবং বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়াও তাই আজ সে এত দুর্ব্বল এবং দ্বিধাগ্রস্থ।

রক্তকরবী নাটকের আরও একটি দিক আছে। সে হইতেছে বর্ত্তমান জগতের নানা দেশের রাষ্ট্রশাসন ধারার বিকৃত রূপের প্রতি তীব্র কষাঘাত এবং বিদ্রূপ। বিশেষতঃ পরাধীন ভারতে ব্রিটীশ বিউরোক্রেশির পাশবিক শাসনের নারকীয় স্বরূপটি অতি স্বাভাবিক ভাবে রূপায়িত হইয়াছে এই নাটকে।

পর্য্যায়ক্রমে শাসকদের নানা স্তর আছে। সবার উপরে আছেন রাজা—তারপর ক্রমে ক্রমে বড়, মেজ, ছোট, সর্দ্দার, মোড়ল, গুপ্তচর প্রভৃতি। আছে প্রপাগ্যাণ্ডার ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করিবার সকল রকম আয়োজন। এ সকল বর্ণনার দ্বারা যেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্যের নবযুগের কবির দলও সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতার স্বরূপ, মানুষের বিকৃত জীবন যাত্রার নানাদিকের নগ্নরূপ দর্শনে মনে প্রাণে শঙ্কিত হইয়া উঠেন। মানুষ যেন প্রাণহীন ইচ্ছা-শক্তিহীন যন্ত্রপরিচালিত জীব। প্রত্যেকেই সকল বিষয়ে মনে মনে সন্দেহ পোষণ করিতেছে, সব ব্যাপারেই

সকলের সংশয় এবং দ্বিধা। কোনও কিছু নিঃসঙ্কোচে করিবার মত মনের বল এবং বুকের পাটা কাহারও নাই। যুদ্ধোত্তর কালে সভ্যতার মূলে যে ভাঙ্গন দেখা দিল, ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে যন্ত্রকে ধ্বংসের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করাই তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। সমাজ ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য যে মানুষকে কতটা নীচে নামাইয়া দিতেছে এবং তাহার সকল দুঃখদুর্দ্দশার একটি প্রধান কারণ, ইহাও প্রতিভাত হইল এই সকল কবিদের কাছে।

যুদ্ধের নারকীয় পরিণাম সারা ইউরোপকে যেন এক বিরাট মহাশ্মশানে পরিণত করিল। এই বীভৎসতা পাশ্চাত্যের মানব মনে যে তীব্র হতাশা এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিল তাহা অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে আধুনিক যুগের বিখ্যাত কবি T.S. Eliot এর বহু কবিতায়। 'Ash Wednesday অবধি তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন সেসকলই এই যুদ্ধোত্তর কালের ভয়াবহ, গ্লানিময়, আদর্শচ্যুত ও বেদনার্ত্ত ইউরোপের সমাজ জীবন এবং মানুষের বিকৃত এবং অসুস্থ মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। এ সম্বন্ধে ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'Modern Tendencies in English Literature' বইতে লিখিয়াছেন—

Eliot's death haunted imagination saw human beings as bones, the contemporary scene as a wasteland, a rocky barrenness, and nothing but a miracle, a sudden shower from above could save humainty. An oppressive consciousness of the past, a cosmopolitan awareness of the present and always a fretting with time, with problems of will, and the futility of mere esistence and death, are to bə found in his poetry."

যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আবির্ভাব এই miracle এরই মত। ওখানকার মানুষদের পক্ষে সেই তো এই 'a sudden shower from above'. তাহারই প্রাণশক্তির প্রভাব জীবন্মৃত যক্ষপুরবাসীদের জন্য বহন করিয়া আনিয়াছে মৃতসঞ্জীবনী সুধা। তাই রাজা হইতে সুরু করিয়া অধ্যাপক এবং এমন কি সেখানকার সর্দ্দারেরা পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে নন্দিনীর আবির্ভাবে। পূর্ণভাবে প্রাণশক্তিতে মণ্ডিত বলিয়াই নন্দিনী এত সুন্দর এবং শক্তিময়ী। এইজন্যই অসাড় যক্ষপুরীর বুকে সে একটা সাড়া জাগাইয়া দিয়াছে—ওখানকার নিশ্চল পাথরের মত মানুষগুলির মনকে তরল এবং কাব্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

'The Waste Land' এবং তাঁহার অন্যান্য বেশীর ভাগ কাব্যেই Eliot দেখাইতে চাহিয়াছেন বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা এবং কৃষ্টির অসাড়তা, অসার্থকতা এবং অসাফল্য! দৃঢ় মনে কিছু ভাবিবার বা করিবার শক্তি মানুষ হারাইয়াছে। সর্ব্ববিষয়েই সন্দেহ এবং সংশয়। মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া কোনও কাজ করিবার মত শক্তি নাই—সকলে যেন ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় যন্ত্রবৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবন যাপন করিতেছে।

মতামতের ব্যাপারে দৃঢ়তার অভাবের দিকে ইঙ্গিত করিয়া Eliot বলিয়াছেন—

> Time for you and time for me,
> And time yet for a hundred indecisions,
> And for a hundred visions and revisions,
> Before the taking of a toast and tea.
>
> In a minute there is time
> For decisions and revisions which a minute will reverse.
>
> (The love song of J. Alfred Prufrock—T. S. Eliot.)

'রক্তকরবী'তে কবি যে তপ্ত-সৈকতময়-মরুপ্রান্তর সদৃশ আধুনিক জীবন, সভ্যতা এবং সমাজের ছবি আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন —'রক্তকরবী'র রাজা এক জায়গায় নন্দিনীকে বলিতেছেন :— "আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।"—তাহার সঙ্গে Eliot এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে মূলতঃ উভয়ে একই সত্যের প্রতি সঙ্কেত করিতেছেন :

"Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.

I am an old man,
A dull head among windy spaces."
Gerontion—Eliot.

আধুনিক বিশৃঙ্খল এবং নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে ভয়াবহ অনুর্বরতা, তাহাই The Waste Land এ অতি সূক্ষ্মভাবে সঙ্কেতের সাহায্যে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। Miss Babette Deutsch, Eliot সম্বন্ধে আলোচনায় বলিয়াছেন :

"Not least significant are the lines :
'The memory throws up high and dry
A crowd of twisted things.'

The dryness of barren shore which will take on monstrous proportions in The Waste Land : 'Rock and no water and the sandy road, becoming the symbol of infertility and spiritual famine, is thus one of Eliot's

earliest-images. The crowd of twisted things anticipates the distortions which, in the larger poem, cry out that the times are out of joint."

এইবার The Waste Land হইতে কিছু কিছু তুলিয়া দেওয়া যাক :

"What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish ? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,
(Come in under the shadow of this red rock),
And I will show you something different from either.

* * * *

Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet."

[The Burial of the Dead—Eliot. "The Waste Land."

"Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock

Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand nor lie nor sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of mudcracked houses
If there were water

And no rock
If there were rock
And also water
And water
A spring
A pool among the rock
If there were the sound of water only

Not the cicada
And dry grass singing
But sound of water over a rock,
Where the hermit-thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water

Who is the third who walks always beside you ?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
—But who is that on the other side of you ?

What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal
[What the thunder said—Eliot :—"The Waste Land."

ইহারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় Macleish এর The Pot of Earth এ :

Seven days I have been waiting for the rain now,....
There was nothing to do, there was nothing to do but wait
But wait, but wait, but wait,
And the wind whispering
Something I couldn't understand beneath the door....

আধুনিক যুগের মানুষদিগের বর্ণনা করিতে গিয়া Eliot বলিয়াছেন—

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas !
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats feet over broken glass

In our dry cellar
Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion ;
Those who have crossed
With direct eyes, to death's other Kingdom
Remember us—if at all— not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.
["The Hollow Men."

আবার আধুনিক যুগের বর্ণনায় Ezra Pound বলিয়াছেন—

Our generation was brought up in absolute economic illiteracy. Only the most tortured and active among us have been driven to analyse the hell that surrounded us. Monetary infection has penetrated the inmost crannies of mind ; the virus has been so subtle that men's minds (souls—call'em souls if that concor with your religion) have been strangled before they knew it. How, indeed, can an animal be aware of its death if it is first narcoticised, if the death comes as a gradual sleepiness, then sleep, a creeping First into the very organs of perception ?

The 'pore' and a few of the most unruly writers have been up against hunger, or the imminent danger of hunger ; been dumped on the pavement with half-a-crown for their fortune, and thereby jabbed into thinking ; but the deep evil has come during sleep ; we have, almost to a man, been infected when we least knew it , when we least intended an evil."

(Polite Essays—Ezra Pound.

অতিরিক্ত বস্তুতন্ত্রবাদ মানুষকে আলোর জগৎ হইতে—আনন্দের জগৎ হইতে ক্রমাগত দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। যাহা সহজ, যাহা সুন্দর, যাহা প্রাণময়, সে সকলকে ত্যাগ করিয়া মানুষ মৃত এবং জড়বস্তুর সাধনায় মাতিয়া উঠে। মিথ্যা মরীচিকায় ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ অন্ধকারের গর্ভে নিমজ্জিত হইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে 'রক্তকরবী' হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :

নন্দিনী—অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত সহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক—আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

....

অধ্যাপক—সব জিনিসকে টুক্‌রো ক'রে আনাই এদের পদ্ধতি।

....

গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না।

....

নেপথ্যে—আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না, শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না।

....

নেপথ্যে—নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মত একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম···ইত্যাদি।

এখানে আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ধনতন্ত্র পরিচালিত যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ যে শক্তি অর্জ্জনে নিজকে নিয়োজিত রাখিয়াছে তাহাই বোঝা হইয়া তাহাকে ক্রমাগত পিষিয়া ফেলিতেছে।

বিশু—যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে।

যান্ত্রিক জগতের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মানুষের সৌন্দর্যানুভূতির ক্ষমতা লুপ্ত হইতে থাকে এবং যান্ত্রিক-মানুষ সকল কিছুর মূল্য নিরূপণ করিতে শেখে উপযোগীতা অনুসারে।

বিশু—পাজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দু'দিন দু'দিনের পর তিন দিন; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু'হাত, দু'হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু'তাল, দু'তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা।

ফাগুলাল—পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু—আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।············

ওই সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ।........................

সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই............

এইবার W. H. Auden এর 'Poems' বইটি হইতে কয়েকটি কবিতার আলোচনা করা যাক্ :

আধুনিক জীবনের সংশয় এবং অর্থশূন্যতার কথা বলিতে গিয়া Auden লিখিয়াছেন :

Here am I, here are you :
But what does it mean ? What are we going to do ?
(Poem IX)

যান্ত্রিক জীবনের চিত্র—

Smoke rises from factory in field
Memory of fire : on all sides heard
Vanishing music of isolated lark :
(Poem XVI)

অর্থাৎ জীবন হইতে সৌন্দর্য্যকে ক্রমাগত দূরে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে।

আধুনিক জগতে শিল্পের প্রসার যে কি ভাবে প্রাকৃতিক বৈভবরাশিকে নষ্ট করিতেছে, সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

Go there if you can and see the land you once were proud to own
Tho' the roads have almost vanished and the expresses never run :
Smokeless chimneys, damaged bridges, rotting wharves and choked canals....etc.
(Poem XXII)

বৈজ্ঞানিক শক্তির বিকৃত ব্যবহারে মানুষ যে কিভাবে নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার সুন্দর ছবি পাওয়া যায় Aldous Huxley-র কিছুদিন আগে প্রকাশিত Ape & Essence পুস্তকে। যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ আপন মনুষ্যত্ব হারাইয়া যন্ত্র-মানুষ রূপেই গড়িয়া উঠিতেছে। আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার Eugene O'neill তাঁহার The Hairy Ape নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে Fifth Avenueতে যে সকল পুতুল মানুষের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন তাহারা এই সত্যেরই প্রতি নির্দ্দেশ দেয়।

রক্তকরবীতে রূপক এবং সঙ্কেতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। মোটা-মুটি একটা তত্ত্বের দিকে আছে বটে এবং সেইজন্যই ইহাকে অনেকেই রূপকনাট্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ রূপকে যেরূপ crude ভাবে তত্ত্ব পরিবেশিত হয়, তাহা এখানে হয় নাই। আর তা ছাড়া নাটকটির ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে সাঙ্কেতিক ইঙ্গিত এবং ইশারা। চরিত্রগুলি ও সাঙ্কেতিকতায় ভরা। আবার কবি বলিয়াছেন ইহা রূপক নয়—'রক্তকরবী'র সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' নামে একটি মানবীর ছবি। একে তো নাটকটি এমনিতেই অত্যন্ত জটিল—তার উপর আবার কবির এই উক্তি যেন ইহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। আমার ধারণা কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে রূপকনাট্য বলিতে যে নীচস্তরের উপদেশাত্মক তত্ত্ব-সর্ব্বস্ব নাটককে বুঝায় 'রক্তকরবী' সে স্তরের নহে। নন্দিনী নাম্নী নারী কিভাবে তাহার প্রচণ্ড প্রাণশক্তির দ্বারা এক নির্জীব দেশের নির্জীব নরনারীর অন্তরে-বাহিরে প্রাণস্পন্দনের সাড়া এবং চাঞ্চল্য আনিল সে-কাহিনীই এই নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে।

আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার মত। কবি যে দৃষ্টিতে তাঁহার পাত্রপাত্রীকে দেখিতেছেন তাহার সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর

একটা পার্থক্য আছে। অধিচেতন মনের সাহায্যে কবি বস্তুর বা ব্যক্তির একেবারে অন্তরতম রূপের পরিচয় পাইতেছেন। এই রূপই তাঁহার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব—সরল, সত্য এবং সহজ। নন্দিনী, রাজা, বিশু প্রভৃতি চরিত্র তাঁহার কাছে অতি প্রাণবন্ত এবং বাস্তব চরিত্র—তাঁহার কাছে ইহারা abstractions নয়, সত্যিকার জীবন্ত মানুষ। এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং অধিচেতনতা নাই বলিয়াই আমাদের দেখার মধ্যে এবং রবীন্দ্রনাথের মত বিরাটকল্পনা-শক্তি সম্পন্ন কবির দেখার মধ্যে তারতম্য ঘটে। আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তির কাছে যাহা অত্যন্ত real মনে হয়, গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যায় তাহার কোন অর্থ নাই। আসল রূপটাই আমরা ধরিতে পারি নাই। আবার আমাদের নিকট যাহা অপ্রত্যক্ষ বা অস্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথের মতো Supra-Conscious মনোশক্তি সম্পন্ন মহাকবির কাছে তাহাই অতিশয় স্পষ্ট, real এবং natural. এই সকল কারণেই 'রক্তকরবী'কে তিনি রূপক সংজ্ঞা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁহারা মনে করেন চরিত্রচিত্রণ এবং প্লটের দিক দিয়া বিচার করিলে 'রক্তকরবী'কে খুব পাকা নাটক বলা চলে না। পাশ্চাত্যেও একদল সমালোচক সাঙ্কেতিক নাট্যকে no-plot plays নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শুধু মেটারলিংকের নাটকগুলি সম্বন্ধেই এই মতবাদ প্রযোজ্য। জার্ম্মান নাট্যকার হাউপ্ট্‌মানের সাঙ্কেতিক নাটকগুলির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন, কি চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়া, কি প্লটের ব্যাপারে, এ নাটকগুলি অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি সম্বন্ধেও উদ্ভট এবং হাস্যকর মতবাদ প্রকাশের পূর্ব্বে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। নন্দিনীর প্রভাবে কি ভাবে যকরয়াজের মনে অত্যাশ্চর্য্য

পরিবর্ত্তন আসিল ইহাই নাটকের প্লট। ইহাকেই ধীরে ধীরে অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে অদ্ভুত কলাকৌশলের সাহায্যে। শেষ পর্য্যন্ত নিজের বিরুদ্ধে রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নন্দিনীকে বলিলেন—

"রাজা—তা-হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন।

নন্দিনী—কোথায় যাব।

রাজা—আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারি হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙ্গে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মুক্তি।"

রক্তকরবী নাট্যের পরিচয় দিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—"ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কি সে-সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাক নাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতেরা বলেন পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে, সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুরঙ্গ খোদাই চলছে, এই জন্যই লোকে আদর ক'রে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে।

....

যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের

ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করেনা। এইটুকু জানি যে, এঁর একটি ডাক নাম আছে—মকররাজ।

....

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানালা আছে। সেই জলের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন।

....

এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা একসময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধি বিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানতঃ মোড়লদের' পরে।

এছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্নগ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাঁকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনা জালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিঁকতে দেয়না বুঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানালার বাহির বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানালাটি যে কি রকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যে ঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানালার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে, তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।”

নাটকের সুরু রাজার জালের-জানালার বাহিরে নন্দিনী ও সুরঙ্গ খোদাইকর বালক কিশোরের সাক্ষাতে। নন্দিনীর ভিতরে প্রাণশক্তি, সৌন্দর্য্য, এক কথায় যাহা কিছু আমাদের মনকে টানে, আমাদের অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে সীমার বন্ধন অতিক্রম করিয়া অসীমের পানে ধাবমান হইতে—এসকলের সমন্বয় হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া নন্দিনী abstraction নয়। নন্দিনী যক্ষপুরীতে যন্ত্রপিষ্ট পুতুল-মানুষের মধ্যে একটা প্রাণের আলোড়ন জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহাদের একঘেয়ে অভ্যস্থ জীবনের মাঝে নন্দিনীর আবির্ভাবে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। কিশোরের ভিতর দিয়া কবি কৈশোর কালকে রূপায়িত করিয়াছেন। রঞ্জন পূর্ণ যৌবনের প্রতীক—আনন্দ আবেগ ছন্দ এবং গতির অপূর্ব্ব সমাবেশ রঞ্জনের মধ্যে। এই নাটকে কোন সময়েই জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও সর্ব্বক্ষণই সর্ব্বত্রে তাহার অস্তিত্ব আমরা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করি।

যে সকল গুণাবলী রঞ্জনের যৌবনের মধ্যে পরিপূর্ণতা এবং পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহারই কৈশোর অবস্থার রূপ কিশোর চরিত্রে বিকশিত।

সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে গিয়া Oscar Wilde বলিয়াছেন :

Beauty is a form of Genius—it is higher, indeed, than

Genius, as it needs no explanation. It is of the great facts of the world, like sunlight, or springtime, or the reflection in dark waters of that silver shell we call the moon. It can not be questioned. It has its divine right of sovereignty."

নন্দিনীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিশোর ছন্দের সুরে ডাকিতে থাকে—নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী! এই ডাকের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে কিশোরের অন্তরেব কত ব্যাকুলতা, কত সঙ্গীত, কত বিস্ময় এবং আবেগ। এই ডাকার ভিতর ভয়ের কারণ আছে, তবু ভাল লাগে বলিয়াই সে ডাকে। যক্ষরাজের যন্ত্রপুরীতে প্রাণশক্তিকে আহ্বান করা যে একটা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। এখানকার মানুষ সকলেই তো কলের পুতুলের মত। সকলেই জীবন্মৃত। প্রাণ-শক্তির আরাধনার এবং সৌন্দর্য্যের অনুভূতির অধিকার তো এখানকার মানুষের নাই।

কিন্তু কিশোর এ সকলকে অগ্রাহ্য করিতে চায়—সোনার তাল খুঁরিবার মাঝে সময় চুরি করিয়া সে নন্দিনীর জন্য ফুল তুলিয়া আনিতে আনন্দ পায়। নন্দিনী রক্তকরবী ভালবাসে। এই রক্তকরবী ফুল প্রেম, মুক্তি, এবং বিদ্রোহের ভাবের প্রতি সঙ্কেত করিতেছে। এখানে একটি মাত্র গাছ। সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সেখান হইতে নিজে হাতে নন্দিনীর জন্য এই দুর্লভ রক্তকরবী ফুল তুলিয়া আনিবে ইহাতেই তাহার আনন্দ। তাহার জন্য যে শাস্তি পাইতে হইবে তাহার ব্যথায় ফুলগুলি আরোও একান্তভাবে কিশোরকেই স্মরণ করাইবে নন্দিনীর কাছে!

এরপর প্রবেশ করে অধ্যাপক। গ্রন্থকীট অধ্যাপকের মনেও নন্দিনী চমক লাগাইয়াছে। সে ও চায় নন্দিনীর সঙ্গ—তাহার সঙ্গে

দুই একটা কথা বলিতে। অধ্যাপকের এ জ্ঞান আছে যে দরকারের বাঁধনে নন্দিনীকে বাঁধা যায় না। দরকারের ব্যাপারটা খোদাইকদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—যাহারা পৃথিবীর বুক হইতে দরকারের বোঝা তাল তাল সোনা লইয়া আসিতেছে। অধ্যাপকও বোঝে যক্ষপুরীর যা কিছু ধন, সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন—সোনা। কিন্তু সুন্দরী নন্দিনী যে সোনা সে তো ধুলোর নয়। সে যে আলোর।

নন্দিনী অধ্যাপকের প্রাণে বিস্ময় জাগাইয়াছে। অধ্যাপক বলে —"সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো।"

এদেশের সব কাণ্ড কারখানা দেখে নন্দিনী অবাক্ হয়ে যায়। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে এরা যক্ষের ধন বের করে আনে, অনেক যুগের মরা ধন—পৃথিবী যাকে কবর দিয়ে রেখেছিলো। অধ্যাপক বলে, 'আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তাল বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠার মধ্যে।'

জড়বাদীরা মনে করে যে পার্থিব বিত্তের প্রাচুর্য্যের দ্বারাই তারা পৃথিবীকে আপন বশে আনিবে।

বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা এবং ধনতন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়া আছে পাশবিক শক্তিলাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা এবং একটা নারকীয় লোভ এবং লোলুপতার ভাব। এই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতীক যক্ষপুরীর মকররাজ বাস করেন একটি জটিল জালের আবরণের মধ্যে। বর্ত্তমান যান্ত্রিকতার যুগে যে কোনো রাষ্ট্রের ঠিক শক্তি কেন্দ্র কোথায় এ কথার উত্তর দেওয়া মুস্কিল। শুধু রাজাই এই জটিল জালের আবরণের মধ্যে বাস করেন না। বর্ত্তমান যুগে রাজ শক্তির

সহিত প্রজা সাধারণের কোনো সম্বন্ধ নাই। নিজেদের চারিধারেও যান্ত্রিকযুগের মানুষ এক একটা জাল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ তাহার মাঝে বাধার সৃষ্টি করিতেছে এই জালের আবরণ।

অধ্যাপক বলে—"আমিও আছি একটা জালের পিছনে, মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে।" নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে—"এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আন্‌লে না কেন।"

অধ্যাপক বুঝাইয়া বলেন যে "সব জিনিষকে টুকরো ক'রে আনাই এদের পদ্ধতি।......একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দ্দারেরা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আন্‌লে তাদের হবে কী"।

রঞ্জন যৌবনের এবং আনন্দের প্রতীক। যক্ষপুরী গ্রহণ লাগা পুরী। দস্যুবৃত্তিই এখানকার লোকের জীবনের আদর্শ। মা বসুন্ধরাকে খাব্‌লে খাবলে কে কতোটা খেতে পারে তার উপর নির্ভর করে এদের জড়বাদী মনের সার্থকতা। এখানকার লোকেরা নিজেরা আস্ত নয় এবং কারোকে আস্ত রাখতে চায় না। এখানকার পরিবেশ থেকে রঞ্জনকে নিয়ে দূরে চলে যেতে উপদেশ দেয় অধ্যাপক। নন্দিনীর কিন্তু বিশ্বাস যে রঞ্জনকে আন্‌লে এখানে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে। নন্দিনী অধ্যাপককে জানায় যে "আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।"

অধ্যাপকের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে সুরঙ্গ খোদাইকর গোকুল। গোকুল যন্ত্রযুগের যন্ত্রজাতীয় মানুষদের প্রতিভূ। নন্দিনীকে দেখে সেও চঞ্চল হয়ে ওঠে—কিন্তু তার অভ্যস্থ যান্ত্রিক জীবনের মাঝে প্রাণশক্তির আবির্ভাবকে বিশ্বাসের চোখে দেখতে পারেনা—তার ভয় হয় এর পেছনে কোনো সর্ব্বনাশের ইঙ্গিত আছে। সবাইকে সাবধান করে দেবার জন্য সে এ স্থান ত্যাগ করে।

নন্দিনী রাজার জালের দরজায় গিয়া আঘাত দেয়। নেপথ্য হইতে রাজা জবাব দেন তিনি এখন ভয়ানক ব্যস্ত। নন্দিনী তাহার প্রাণের খুশী লইয়া ভিতরে যাইতে চায়—নিজের আনন্দ দিয়া সে সব কিছুকে আনন্দময় করিয়া তুলিবে এই তাহার বাসনা। পদ্মপাতায় ঢাকিয়া সে রাজার জন্য কুন্দফুলের মালা গাঁথিয়া আনিয়াছে রাজা বলেন, 'আমি পর্ব্বতের চূড়ার মত, শূন্যতাই আমার শোভা।"

'সেই চূড়ার বুকেও ঝরণা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে' —জবাব দেয় নন্দিনী।

পাকা ফসল কাটিবার সময় হইয়াছে—দূর হইতে পৌষের গানের ধ্বনি ভাসিয়া আসে—'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ইত্যাদি।'

এখানে দুইটি বিপরীত ভাবের সংঘাত সৃষ্টি করিয়া কবি একটি বড় সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। রাজা যান্ত্রিকতার প্রতীক—যান্ত্রিকতার দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে পর্ব্বত চূড়ার মত গগনস্পর্শী বস্তুস্তূপ—একটা হাহাকার মিশ্রিত বিরাট শূন্যতার বোঝা। যান্ত্রিক-সভ্যতা চায় সব কিছুকে গ্রাস করিতে—সকলের মধ্যেকার প্রাণশক্তিকে সমূলে উৎপাটন করতে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য তো সফল হইতে পারে না। এ যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা। প্রকৃতি যে প্রাণদায়িনী।

প্রকৃতির ধর্ম্মই হইল প্রাণ সৃষ্টি করিয়া সকল কিছুকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলা। গাছপালা, ফুল-ফল, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া চারিদিকে আনন্দের সুরলহরী বহাইয়া দেন প্রকৃতিমাতা—চারিদিকে ধ্বনিত হইতে থাকে জীবনের পরিপূর্ণতা এবং জয় সঙ্গীতধারা। পৌষের পাকাধান এবং ফসল পাকার গান এই নির্দ্দেশই দিতেছে যে ধ্বংস কখনও সৃষ্টিকে অতিক্রম করিবার শক্তি ধরে না, কদর্য্যতা সৌন্দর্য্যকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে না, ধনের চেয়ে ধান্যের

সার্থকতা অধিকতর, পশুশক্তির এমন সামর্থ নাই যে জীবন হইতে সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

নন্দিনী রাজাকে খোলা মাঠের মাঝে প্রকৃতির বুকে লইয়া যাইতে চায়। সেখানে রাজা সহজ কাজের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন কাটাইতে পারিবেন।

নেপথ্য হইতে জবাব আসে—'সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেণার নূপুর-পরা ঝরণার মতো নাচ্‌তে পারে।" যান্ত্রিকতায় যাহাকে অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে সে কি কখনও এত সহজে 'সহজের মাঝে' 'আনন্দের মাঝে' ফিরিয়া আসিতে পারে। রাজার প্রচণ্ড শক্তির প্রতি কিন্তু নন্দিনীর শ্রদ্ধা আছে। তবে প্রকৃতির আনন্দের সৃষ্টি ধানের ক্ষেতে যে ছন্দের ঢেউ খেলিয়া যায় তাহার একান্ত অভাব বৈজ্ঞানিক জড়শক্তিতে কৃত বস্তুপুঞ্জের মাঝে।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরাধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

নেপথ্যে—কেন, ভয় কিসের।

নন্দিনী—পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিষ আপনি খুশী হ'য়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুকচিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কাণা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ, না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে?

নেপথ্যে—অভিসম্পাত?

নন্দিনী—হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

ধনতন্ত্র পরিপুষ্ট যান্ত্রিক-সভ্যতার কি চমৎকার রূপবর্ণনা। কাহারও প্রাণে সহজ আনন্দ নাই। সকলেরই মন ক্রোধ

সন্দেহ এবং ভয়ে সদাই দ্বিধাগ্রস্ত। মকররাজের ইচ্ছা হয় অন্যান্য বস্তুর মত নন্দিনীকেও পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে—তাহা না পারিলে চায় তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে। কিন্তু একথাও রাজা বোঝে শক্তির দ্বারা আর সব পাওয়া গেলেও আনন্দ, মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্যকে আয়ত্বে আনা যায় না। তাই সে বলে—"তোমার ওই রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন ক'রে পরতে পারিনে কেন। সামান্য পাপড়ি ক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে—কোমল ব'লেই কঠিন।"

রাজা একথাও বোঝে তাহার সঙ্গে রঞ্জনের তফাৎটা কোথায়। তাহার নিজের মধ্যে আছে কেবল শক্তি, রঞ্জনের মধ্যে আছে যাদু। সে মানুষের প্রাণে আনে জড়তা আর রঞ্জন আনে বিস্ময়, সে মৃত্যুর মন্ত্রে সকলকে দীক্ষা দেয় আর রঞ্জন প্রাণের বন্যাবেগে চারিদিক প্লাবিত করিয়া তোলে।

রাজার ভিতর দুর্ব্বার শক্তি আছে একথা যেমন সত্যি আবার তেমনি ভিতরে ভিতরে রহিয়াছে এক অসীম ক্লান্তির ভাব। জীবন হইতে আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যকে বাদ দিয়া যে শক্তি গড়িয়া ওঠে তাহার ভিতর ক্লান্তির ভাব আসাটা যে অতিশয় স্বাভাবিক একথা কে অস্বীকার করিবে।

রাজা মনে মনে উপলব্ধি করিতে পারে যে বিরাট শক্তির অধিকারী হইয়াও সৃষ্টি করিবার কোনো ক্ষমতা তাহার নাই। পাহাড় যেমন বিরাট অথচ অনুর্ব্বর সেও ঠিক তাই। নন্দিনী যেন ছন্দের রাণী। ছন্দই তাহাকে এমন সহজ এবং সুন্দর করিয়াছে। এতো বিরাট শক্তির অধিকারী হইয়াও সে নন্দিনীকে গ্রাস করিতে পারে না। শক্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যকে জোর করিয়া লাভ করিবার চেষ্টা বাতুলতা একথা যেন

শক্তিমানেরা বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না। নন্দিনী প্রস্থান করিলে পর দেখা দেয় খোদাইকর ফাগুলাল ও তাহার স্ত্রী চন্দ্রা। অল্পক্ষণ পরে আসে বিশুপাগল এবং তারপরে খোদাইকর গোকুল। নন্দিনীর আবির্ভাব এদের সকলের উপরেই বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—সকলের প্রাণেই সাড়া আনিয়াছে। চন্দ্রা মনে করে নন্দিনী "মায়াবিনী—মায়া জানে।" ফাগুলাল উপলব্ধি করে এই যক্ষপুরে তাহাদের মনুষ্যত্ব কি ভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তাই সে বলে—"নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সাম্‌নে কথা কইতে পারিনে।" গোকুল তার যান্ত্রিক জীবনেই অভ্যস্থ। এই পরিবেশে নন্দিনী যেন ঠিক খাপ খায় না—এইজন্যই গোকুলের মনে খটকা। তাই সে বলে—"দেখো বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেক্‌ছে না।"

বিশু চরিত্র অনেকটা কবির ঠাকুর্দ্দা জাতীয় চরিত্রের ন্যায়। তাহার ভিতরকার যাহা কিছু কালো তাহা দুঃখের আগুনে শুদ্ধ এবং পবিত্র হইয়া গিয়াছে। জীবনে বেদনা পাইয়াছে বলিয়াই তাহার ভিতর একটা স্বাভাবিক দার্শনিকতার ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে।

সর্দ্দার আসিয়া প্রবেশ করে এবং কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর জানায় লোকেদের ভালকথা শুনাইবার জন্য কেনারাম গোঁসাইজীকে আনানো হইয়াছে। বলিতে বলিতেই গোঁসাইজি হাজির হন—গোঁসাইয়ের কথাবার্ত্তা এবং ভাবভঙ্গী হাসির উদ্রেক করে সন্দেহ নাই তবে এই চরিত্রটি শুধু হাল্কা হাস্যরসের অবতারণার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই! ধনতন্ত্র পরিচালিত রাষ্ট্রে লোকের প্রাণশক্তিকে সুপ্ত রাখিবার এক প্রধান সহায়ক ধর্ম্মের-আফিম্ এই কথাই ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে।

ইহারা বিশুকে জিজ্ঞাসা করে কি ভাবে নন্দিনী উহাকে ভুলাইয়াছে। বিশু বলে—"ভুলিয়েছে দুঃখে।"

ফাগু চায় আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং উত্তরে বিশু জানায়—"বলছি শোন, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে-দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্খার যে-দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে"।

এখানে কাছের পাওনা দ্বারা ক্ষুদ্র লোভকেই বুঝাইতেছে। দূরের পাওনার অর্থ অসীমের জন্য ব্যাকুলতা। দূরকে পাইবার আকাঙ্খার সহিত সকল সময়েই একটা বেদনার ভাব যুক্ত থাকে—তাই ইহা এত মধুর। ইহার সহিত তুলনীয় শেলীর নিম্নোক্ত লাইনগুলি—

The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

বিশু বাদে ইহারা একে একে চলিয়া যায় এবং নন্দিনী পুনঃপ্রবেশ করে। বাহিরে পৌষের গান শুনিয়া ওর মন আজ খুশীতে ভরা—ওর ইচ্ছা প্রাকারের উপর চড়িয়া গানে যোগ দেয়। কোথাও পথ না পাওয়াতে বিশুর কাছে আসিয়াছে।

বিশু বলে—'আমি তো প্রাকার নই!

নন্দিনী—তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।"

সংসারে এমন এক ধরণের লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহাদের চরিত্রের মাহাত্ম এবং বিরাটত্ব বুঝিতে না পারিয়া সাধারণে তাঁহাদের পাগল আখ্যা দেয়। বিশু এই জাতীয় চরিত্র। সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া বাহির বিশ্বের আনন্দোৎসবে যোগ দিবার জন্য নন্দিনীর বিশুরই সাহায্য প্রয়োজন হয়। বিশু যে দার্শনিক। তাহার সংস্পর্শে আসিলে মন উন্মার্গগামী হয় একথা নন্দিনীর অজানা নয়। বাহিরকে জানিতে

হইলে, অসীম সম্বন্ধে ধারণা করিতে গেলে বিশুর সাহায্য অপরিহার্য্য একথা নন্দিনী বেশ উপলব্ধি করে এবং মনে প্রাণে অনুভব করে। বিশুর এতকাল মনে হইত জীবন হইতে তাহার আকাশখানা বুঝি হারাইয়া গিয়াছে। নন্দিনীকে বলে—"এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে।" সুতরাং বিশুরও প্রয়োজন নন্দিনীকে। নহিলে তাহাকেও মৃতবৎ ব্যক্তিত্বহীন পুতুলের মতো জীবন কাটাইতে হইত।

নন্দিনী বিশুর—"ঘুম-ভাঙানিয়া"—অর্থাৎ যে মোহনিদ্রায় বিশু এতকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া অভিভূতভাবে কাল কাটাইতে ছিল, আপন প্রাণশক্তির প্রভাবে নন্দিনী তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে। নন্দিনীই আবার বিশুর—"দুখ-জাগানিয়া"। অসীমের রহস্য এবং আনন্দের বারতা নন্দিনীই বহিয়া আনিয়াছে বিশুর কাছে। ক্ষুদ্রতা হইতে বৃহত্তের দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়াছে, বন্ধনমুক্ত করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়াছে। কিন্তু যে আলোকের সন্ধান দিয়া নন্দিনী বিশুর অন্তরাত্মাকে জাগাইয়াছে, তাহাকে আয়ত্বে আনিবার শক্তি তো মানুষের নাই। ইহা Unattainable ideal—এইজন্যই ইহা বেদনা-মিশ্রিত আনন্দ। তাই বিশু নন্দিনীকে বলে—"তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী"।

বিশু কবি এবং দার্শনিক। তাহার গান এবং দর্শনের ভিতর হইতে যে দুঃখের অনুরণন্ ঝঙ্কৃত হইতে থাকে এতকাল তাহার সহিত নন্দিনীরও কোনই পরিচয় ছিল না। রঞ্জনের কাছ হইতেও সে ইহার কোনো খবর পায় নাই। রঞ্জন যৌবনের পূর্ণতার প্রতিমূর্ত্তি। যৌবনের আবেগ, শক্তি, সাহস, মত্ততা, গতিবেগ প্রভৃতির পরিচয় নন্দিনী তাহার কাছ হইতে পাইয়াছে। তাই নন্দিনী বলে—"দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে

সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়" ইত্যাদি। কিন্তু জীবনের দুঃখ দর্শনের দিকটা বিশুর কাছ হইতেই সে শিক্ষা করিয়াছে। এই-খানেই বিশুর শ্রেষ্ঠত্ব। এইজন্যই তাহার চরিত্র রঞ্জন অপেক্ষা পরিণত এবং সম্পূর্ণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে নন্দিনী এবং বিশু উভয়ের উভয়কে আবশ্যক।

নন্দিনী রাজাকে জালের ভিতরে ঢুকিয়া দেখিয়াছে। বিশু জিজ্ঞাসা করে—"ঘরে ঢুকে কি দেখলে।"

নন্দিনী—"ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল.........
............ইত্যাদি।"

এস্থলে Associational value of symbolsএর উপরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বাজপাখী শিকারী এবং ভয়ঙ্কর দর্শন। ইহার উল্লেখে মানসপটে একটা বিভৎসতার ভাবের উদয় হয়, একটা নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার ছবি ভাসিয়া উঠে। রাজা আধুনিক যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতীক। এই যান্ত্রিকতার মূলে যে নারকীয় বিভীষিকা রহিয়াছে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে নন্দিনীর উপরিউক্ত কথায়।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাজা অন্যান্য বস্তুর মত নন্দিনীকেও জানিতে চায়। একথা বুঝিতে পারে না যে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ দিয়া মানুষের হৃদয়ের রহস্যের কূলকিনারা পাওয়া যায় না। নন্দিনী-রঞ্জনের প্রেমের সম্বন্ধকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারাতে তাই সে খেপিয়া ওঠে।

সর্দ্দারের কাছে রঞ্জন আসিবে শুনিয়া খুশী হইয়া নন্দিনী সর্দ্দারকে কুন্দফুলের মালা দেয়। সর্দ্দার বলে—"জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ-যে হাতের দান,—আর বরণমালা ওই রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান।" মুখে না বলিলেও সকলেরই যেন নন্দিনীর কাছ হইতে এই রক্তকরবী লাভের জন্য মনে মনে লোভ আছে। রক্তকরবী সঙ্কেত করিতেছে

মুক্তি, প্রাণশক্তি এবং বিদ্রোহের প্রতি। যক্ষপুরীর মানুষেরা—অর্থাৎ যন্ত্রযুগের যন্ত্র-মানুষের দল—সচেতনভাবে বা অব-চেতনভাবে সকলেই চায় "রক্তকরবী" অর্থাৎ স্বাধীনতা এবং সৌন্দর্য্য। এই নাটকে এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, যে যাই বলুক শেষ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের কাছে সকলকেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এই নাটকটিতে সর্ব্বত্রই প্রায় রক্তকরবীর প্রাধান্য পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যই যক্ষপুরী নাম না দিয়া কবি 'রক্তকরবী' নাম রাখিয়াছেন।

বিশুকে নন্দিনীর সঙ্গে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করেন—"ও কে তোমার সঙ্গে?"

বিশু বলে—"আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে-পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা।"

বিশুর ভিতর দিয়া জীবনের অন্ধকারের দিক্ অর্থাৎ দুঃখের রহস্যের দিকটাই প্রতিভাত—যেমন রঞ্জনের ভিতর দিয়া জীবনের আনন্দের এবং আলোর দিক রূপায়িত।

রাজার হাতে একটি মরা ব্যাঙ। নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে "কী করবে ওকে নিয়ে।"

রাজা বলে—"এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। এইভাবে কী করে টিকে থাক্‌তে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম, কী করে বেঁচে থাক্‌তে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভাল লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙ্গে ফেল্‌লুম, নিরন্তর টিকে থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি।"

এখানে এই ব্যাঙ যেন যক্ষপুরীর জীবন্মৃত যন্ত্র মানুষদেরই প্রতীক্।

নন্দিনী বলে—"মনের মধ্যে খবর এসে পৌচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।"

বিশু—"নিশ্চয় খবর এল কোন দিক্ থেকে।"

নন্দিনী—"তবে শোনো বলি। আমার জানালার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম ক'রে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালেই জেগে উঠে দেখি উত্তরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।"

উপরি উক্ত কথাগুলির ভিতর দিয়া কবি যে বর্ণ-সমাবেশ এবং রঙের খেলা দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। ডালিমের উল্লেখে আমাদের মানসপটে ভাসিয়া ওঠে রক্তিমাভার লালিমা। আর লাল রঙের সঙ্গে জড়িত মুক্তি এবং বিদ্রোহের ভাব। নীলকণ্ঠ পাখি মনে যে নীলিমার ভাবের সৃষ্টি করে তাহা যে অসীমের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহারা যে রঞ্জনেরই অভ্যাগমের প্রতি সঙ্কেত করিবে তাহা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। রঞ্জন যে এই মুক্তি, বিদ্রোহ এবং যৌবনের অসীম রহস্যের দ্বারাই মণ্ডিত।

এরপর সর্দ্দার এবং মোড়লের কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যায় যে নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও ইহারা রঞ্জনকে বাগ মানাইতে বা বশে আনিতে পারে নাই।" সে বলে "হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যাস নেই।" রঞ্জনের ভয় ডর কিছুই নাই। গলায় একটু শাসনের সুর দেখিলে সে হো-হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। বলে—"গাম্ভীর্য্য নির্ব্বোধের মুখোস, আমি তাই খসাতে এসেছি।" এরা ভাবিল খোদাইয়ের কাজে লাগাইয়া দিলে রঞ্জন শায়েস্তা হইবে। ফল হইল উলটা। খোদাইকরদের সে শিক্ষা দিল নৃত্যের তালে তালে কাজ করিতে। তাহার ফলে উহারা বুঝিল আনন্দের কাজ খেলার মতই প্রিয়—আনন্দহীন কাজের মত বিরক্তিতে ভরা নয়।

শিকল দিয়াও রঞ্জনকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। আশ্চর্য্য উহার ক্ষমতা। উহার সান্নিধ্যে থাকিলে ক্রমে ক্রমে অন্যসকল খোদাইকরও অবাধ্য হইয়া উঠিবে।

এমন সময় সর্দ্দার দেখিতে পায় দূরে রাস্তা দিয়া গান গাহিতে গাহিতে রঞ্জন চলিয়াছে সারেঙ্গী হাতে। সর্দ্দার মোড়লকে বলে "... ধরো তো ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।"

প্রবেশ করে ছোট সর্দ্দার। সে জানায় মেজো সর্দ্দারকে পর্য্যন্ত রঞ্জন চঞ্চল করিয়াছে।

ইহাদের প্রস্থানের পর অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের কথাবার্ত্তায় বুঝা যায় যে রাজার ভিতর এক ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। অধ্যাপক বলে......"কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে ওর সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে......জগতে যা কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে, এখন থেকে থেকে রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সিঁদকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙ্গে তার পিছনে আর একটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণ-পুরুষের অন্দর মহল কোথায়।' ভাবলুম এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক্... ..."

সর্দ্দার আসিয়া জানান্ যে পুরাণবাগীশের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া রাজা খেপিয়া উঠিয়াছেন। রাজার মতে......'পুরাণ বলে কিছু নেই। বর্ত্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।"

আবার নন্দিনী প্রবেশ করে। দূরে কতকগুলি ছায়ামূর্ত্তি দেখা যায়। রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়া সকলে বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহারা নন্দিনীর পূর্ব্ব পরিচিত—অনুপ, উপমন্যু, শকলু,

কঙ্কু প্রভৃতি। একদিন ইহারা ছিল প্রাণশক্তিতে ভরপুর—রঙে রসে টল্‌টল। যক্ষপুরীতে প্রবেশের ফলে আজ উহাদের মানুষ বলিয়া চেনা যায় না। ওদের মধ্যেকার মাংসমজ্জা, মনপ্রাণ আখের মত চিবাইয়া ফেলা হইয়াছে।

টলিতে টলিতে প্রবেশ করে পালোয়ান, অত্যন্ত আহত অবস্থায় বাহির হইতে তাহার আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না। ভিতর হইতে যেন ইহাকে শুষিয়া ফেলা হইয়াছে।

বাঘও বাঘকে খায় না। কিন্তু বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা পাশবিকতায় পশুকেও হার মানাইয়াছে। মানুষ যেভাবে অবাধে মানুষকে শোষণ করিতেছে তাহার তুলনা হিংস্রতম পশুর মধ্যেও বিরল।

কিশোর আসিয়া সংবাদ দেয় যে প্রহরীদের কর্ত্তা বিশুকে লইয়া এই পথ দিয়া যাইবে। বন্দী অবস্থায় প্রবেশ করে বিশু, নন্দিনীকে বলে—"এতদিন পরে আমার মুক্তি হোল।······যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ সাম্‌লে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।"

সাহসের সহিত সত্যকথা বলাতে বিশুকে বন্দী করা হইয়াছে। পশুর মত তাহাকে চাবুক মারা হইয়াছে। মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না—মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া যক্ষপুরবাসীরা তাহাদের ভিতরকার পশুটাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছে।

বিশুর বদলে কিশোর তাহার হইয়া বন্দীত্ব বরণ করিতে চায়। বলে······"শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশী হ'য়ে সইতে পারব।"

বিশু—"না কিশোর, এখনো ধরা পড়লে চল্‌বে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে। যেমন ক'রে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।"

কিশোর বিদায় নেয়। নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে কোন্ কথা জানাইবে। নন্দিনী রক্তকরবীর গুচ্ছ দিয়া বলে রঞ্জনকে উহা দিলেই তাহার সব কথা জানানো হইবে। কিশোর প্রস্থান করে।

বিশু—"এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হ'ক।

নন্দিনী—মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে তোমাকে শূন্য হাতে বিদায় দিয়েছি। আর ওই যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কা বা পেলে। বিশু—মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে।"

দূর হইতে ফসল কাটার গান ভাসিয়া আসে—"শেষ ফসলের ফসল এবার............ইত্যাদি।"

ইহাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে চিকিৎসক ও সর্দ্দার। চিকিৎসক জানায় যে রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ রোগ বাহিরের নয়, ভিতরের। ইহার প্রতিকার বড় রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

আজি কালকার যান্ত্রিক সভ্যতার জগতে এ সকল কথার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। সারা পৃথিবীর লোক আজ মানসিক ব্যাধিতে ভুগিতেছে। কাহারও মনে শান্তি নাই,—চারিদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ, কলহ, অশান্তি। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর সভ্যতার ক্রম বিবর্ত্তন যে ধারায় ধাবিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার পরিণতি যে একদিন এইরূপ নারকীয় এবং বিভৎস রূপই ধারণ করিবে আমাদের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ যেন দিব্যদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পাইয়া এস্থলে সেই সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

রাস্তায় নানা দলের লোক বাহির হইয়াছে—সকলে ধ্বজাপূজার উৎসবে যোগ দিবে। নন্দিনী ইহাদের জিজ্ঞাসা করে রঞ্জনকে কেহ দেখিয়াছে কিনা। ওরা বলে রাজাও বাহির হইবে—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাইবে। উহারা শুরুটা জানে, শেষটা জানে না।

নন্দিনী আসিয়া রাজার জানালায় ঘা দেয়। রাজা বলে—"আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। ——রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দ্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। পূজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।——আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসৃব। আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।"

নন্দিনী সে স্থান হইতে নড়িবে না। রাজাকে সে ভয় করে না। রাজার প্রশ্রয়কে সে ঘৃণা করে বলাতে রাজা উত্তপ্ত হইয়া উত্তর দেন—"ঘৃণা কর? স্পর্দ্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।"

দ্বার উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ভূতলশায়ী রঞ্জনের মৃতদেহ। এ-ই রঞ্জন শুনিয়া রাজাও বিহ্বল হইয়া পড়েন।

রাজা—"ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্ব্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।"

নন্দিনী—"রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি যাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও।"

রাজা—"আমি যমের কাছে যাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতে পারি।"

রাজার মধ্যেও পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সে বুঝিতে পারে এতদিন ধরিয়া সে প্রতি পদে পদে যৌবনকেই হত্যা করিয়া আসিয়াছে।

এবার নন্দিনী রাজাকে শক্তিপরীক্ষায় আহ্বান করে।

রাজা—"তা হ'লে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো নন্দিন্!

নন্দিনী—কোথায় যাবো।

রাজা—আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে।"

"ধ্বজাদণ্ড প্রভৃতি রাজা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দলের লোকেরা ভাবে রাজা বুঝি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। সর্দ্দারদের খবর দিবার জন্য তাহারা ছুটিয়া যায়। সর্দ্দার সৈন্য লইয়া আসিতেছে দেখিয়া নন্দিনী ও রাজা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আগাইয়া যায়।

কারিগরেরা বন্দীশালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বিশু বাহির হইয়া নন্দিনীর খোঁজে আসিয়াছে। ফাগুলাল জানায় সে সকলের আগে গিয়াছে—শেষ মুক্তিতে। ফাগুলাল বিশুকে দেখায় রঞ্জনের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নন্দিনীর সহিত মিলিত হইতে হইবে। এখানে ধূলায় লুটাইতেছে নন্দিনীর হাত হইতে খসিয়া পড়া রক্তকরবীর কঙ্কন। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে বিশু তুলিয়া নেয় সেই কঙ্কণ। আবার দূর হইতে ফসলের গান শুনা যায়—

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
আয় আয় আয়।
ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে
হায় হায় হায়।"

কালের যাত্রা (১৩৩৯)

দুইটি নাটিকার সঙ্কলন—"রথের রসি" ও "কবির দীক্ষা"। ১৩৩০ সালে "প্রবাসীতে" প্রকাশিত রথযাত্রা নাটকের পরিবর্ত্তিত রূপ **রথের রশি।**

মহাকালের রথ দেখিবার জন্য সেই কোন সকালে নরনারীর দল স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—কিন্তু বেলা হইয়া গেল তবু এখন পর্য্যন্ত রথের চাকার শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। পুরুতঠাকুর বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতেছেন—মহাকালের পাণ্ডা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসী আসিয়া জানাইলেন—

"সর্বনাশ এলো।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

....

দেখতে পাচ্ছ না, আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হ'য়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা করেচে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেচে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্চ না, লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র।
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্চে মরুভূমিতে—
ফল্‌চে না কোন ফল।

....

তোমরা কেবলি করেচ ঋণ,
কিছুই করোনি শোধ,
দেউলে করে দিয়েচ যুগের বিত্ত
তাই নড়ে না আজ আর রথ—

ঐযে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

মেয়ের দল ভাবলে, রথের দড়িকে পূজা দিলেই সব হাঙ্গামা মিটবে— তারা দড়ি-দেবতার পূজার আয়োজন করতে গেল। এখানে তরল হাস্যরসের অন্তরালে কবি এই সঙ্কেতই করেছেন যে পূজার নামে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এইরূপ অর্থহীন হাস্যোদ্রেককারী নানা কাণ্ডকারখানা করে থাকি।

মেয়েরা পূজার নানা উপকরণ নিয়ে এসে হাজির হলেন, কত মানত করা হোল, দুধ, ঘি, গঙ্গাজল ঢালা হোল, পঞ্চপ্রদীপ জ্বালা হোল—তবু কিছু হোল না। পুরুতও নড়েন না, এখন মন্ত্র পড়ে কে?

সন্ন্যাসী বললেন—

"কি হবে মন্তরে।

কালের পথ হয়েছে দুর্গম।

কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও গভীর গর্ত।

করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ!

....

দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠেচে বেড়ে।

হয়েচে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিকচে না।

ভেঙে পড়ল বলে।"

মেয়েরা এবার চললেন রাস্তাঠাকুরকে পূজো দিতে। এলেন সৈনিকের এবং নাগরিকের দল। সবাই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ এবং বিচলিত। কেউ রথ চালাতে সমর্থ হন নি।

সন্ন্যাসী সৈনিকদের বললেন—

"তোমরা দড়িটাকে করেচ জর্জর,

যেখানে যত তীর ছুঁড়েচ বিঁধেচে ওর গায়ে।

ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েচে বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
সরে যাও সরে যাও ওর পথ থেকে।”

রাজার তরফ থেকে ডাক পড়ল ধণিকদের প্রতিভূ শেঠজিকে। কারণ আজকালকার দিনে সব কিছুই চলে এঁদেরি কৃপায়। অর্থপাতে সকল অনর্থপাতের মীমাংসা এঁরাই করে দেন সকল সময়। কিন্তু তবু কিছু হোলনা—ধনিকরাও অসমর্থ হলেন রথ চালাতে।

মেয়েরা আবার এলো—অনেক তুক্‌তাক্, ফুঁকফাঁক, পূজা অর্চনা করেও কিছু করতে পারলে না। মন্ত্রী তাদের বললেন, বাসায় গিয়ে জপতপ ব্রত নিয়ম করতে। চর এসে সংবাদ দিলে—গোল বেঁধেচে। শূদ্রের দল ছুটে আসচে রথ চালাবে বলে। মন্ত্রী বাদে সবাই ক্ষেপে উঠলে শূদ্রের আস্পর্দ্ধা দেখে। মন্ত্রীর কিন্তু মনে হচ্ছে এরাই বোধহয় পারবে। এতকাল এদের প্রতি অত্যাচার করে আসা হয়েছে—আজ এরা মাথা উঁচিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাধা দিলে ফল ভাল হবে না। এদের দলপতি মন্ত্রীকে শুনিয়ে দিলে—

“আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচো,
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।”

মন্ত্রীর কাছে অনুমতি নিয়ে এরা রথ টানতে গেল। রথ নড়ে উঠল—মন্ত্রীও এসে এদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অচল রথ সচল হল—পুরোহিতের মন্ত্রশক্তি, ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবীর্য্য, ধনিকের অর্থশক্তি যা করিতে অসমর্থ—এতকালের পদদলিত পিষ্ঠ শূদ্রশক্তি আজ নূতন শক্তির বলে মহীয়ান হইয়া সে কার্য্য সফল করল। যে মুহূর্ত্তে শূদ্রের দল বুঝিতে শিখিল যে অত্যাচারীর দলের সত্যকার কোন শক্তি নাই—শূদ্রের তৈরী অন্ন বস্ত্রেই উহারা পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত, তখনই

নিজেদের আত্মশক্তি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইল। এই আত্ম-পরিচয়ের ফলেই তাহারা উপলব্ধি করিল যে তাহারা অমিতবিক্রমের অধিকারী—সুতরাং মহাকালের রথ চালাইবার যোগ্য অধিকারী তো তাহারাই। শূদ্রদের টানে রথ চলিল দেখিয়া অন্যান্য দল তো হতভম্ব হইয়া গেল। এমন সময় কবি আসিয়া উপস্থিত। পুরুতের হাতে রথ চলিল না, রাজার হাতে না, 'এর মানে কি!'—জিজ্ঞাসা করাতে কবি বলিলেন যে ওদের মাথা ছিল উঁচুর দিকে। নিচের দিককে ওরা অগ্রাহ্য করিয়াই আসিয়াছে; মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক বন্ধন এবং প্রেমের সম্বন্ধ তাহাকে উহারা অসম্মান করিয়াছে। এই কারণেই উহারা রথ টানিতে অসমর্থ হইয়াছে। শূদ্রেরা কি এতই বুদ্ধিমান যে ওরাই দড়ির নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিবে?—এ প্রশ্নের উত্তরে কবি বলিলেন যে ওরাও হয়তো আবার কিছুকাল পরে পারবে না। একদিন ওরাও ভাববে রথের রথি কেউ নেই, আসল কর্ত্তা ওরাই।... এর ফলে মহাকালের রথ আবার হবে অচল।

তখন ডাক পড়বে কবির—যেমন অতীতে বারে বারে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে মহাকালের অচল রথকে সচল করতে। কিসের জোরে কবির এত জোর? কবি উত্তর দিলেন—

"গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে
আমরা মানি ছন্দ, জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার একপাশে বাঁকা;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে।

বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তাল-মানের উপর নয়।”

ছন্দের সঙ্গতি রাখবার জন্যই ঠাকুর আজ শূদ্রদের দিকে পাশ ফেরালেন। অন্যদিকটা বেশী উঁচু হয়েছিল বলে নীচে দাঁড়ালেন ছোটদের দিকে। সেইখান থেকে টানদিয়ে বড়কে কাৎ করে, সমান ক'রে নিলেন নিজের আসনটা। এই ছন্দের মিল, সুরের সঙ্গতি প্রভৃতির জন্যই দরকার হয় কবির। কবিই আমাদের বুঝিয়ে দেন, সব মানুষই সমান—সবার ভেতরই রয়েছে ঐশ্বরিক শক্তির কণা—কেউ কারোর থেকে বড় নয়, কেউ কারোর থেকে ছোট নয়।

কবিদিগের বর্ণনা প্রসঙ্গে শেলি বলিয়াছেন—

Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration ; thc mirrors of the gigantic shadows which futurity casts upon the present, the words which express what they understand not, the trumpets which sing to battle and feel not what they inspire, the influence which is moved not, but moves. Poets are the unacknowledged legislators of the world.”

এই রূপক নাটকটির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন শক্তির হাত-বদলের ইতিহাসই বিবৃত করিতেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এক সময় সকল ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাজার প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছে। তারপর আমাদের দেশে ব্রাহ্মনদিগের ক্ষমতা শক্তির চরম শিখরে উঠিয়াছে। তেমনি আবার পুরাকালে গ্রীসের এথেন্স্ প্রভৃতি নগরীতে leisured classই সকল ক্ষমতার অধিকার উপভোগ করিত। এরপর কিছুকাল সর্ব্বদেশেই পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজকগণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। Industrial Revolution এর পর হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ক্যাপিট্যালিষ্টদের প্রভাব দেখা যাইতে

থাকে। ধনতন্ত্রের অবসানের আরম্ভ হয় শ্রমিক জাগরণের সুরু হইতে। পৃথিবীতে শ্রমিকদিগের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার পরই যে এই ইতিহাস সমাপ্তির পথে যাইবে একথাও কেহ বলিতে পারে না। হয়তো ভবিষ্যতে শ্রমিকদলও একদিন বিলুপ্ত হইবে এবং মনুষ্য সমাজে সকল শ্রেণীগত পার্থক্যের অবসান হইবে। সেদিন হয়তো রাষ্ট্রেরও আর কোন আবশ্যক থাকিবে না, সকল মানুষ সৌভ্রাত্র-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সুখে কাল কাটাইবে। এই অবস্থায় সত্যসত্যই কোনদিন পৃথিবী আসিবে কিনা এবং তারপর আবার নূতন করিয়া মনুষ্য সমাজে দলগত এবং শ্রেণীগত পার্থক্য জন্মিতে থাকিবে কিনা কে বলিতে পারে।

খুব স্পষ্টভাবে না হইলেও এ সকল সত্যেরই প্রতি যেন নাটকটিতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

কালের রথ অচল হইয়াছে কারণ কালের সঙ্গে তাল রাখিয়া জীবন আর অগ্রসর হইতেছে না। যাহারা এতাবৎ এই রথ চালাইতেছিল তাহারা বিকৃতভাবে কালের ব্যবহার করিতেছে বলিয়াই কালের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে, জীবনের সঙ্গীতে ছন্দপতন ঘটিয়াছে। শূদ্রের দলকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াই এই মহাসর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। সেই জন্যই যেই শূদ্রেরা আসিয়া রথের রশিতে হাত দিল, অমনি বিকৃত অবস্থার অবশান ঘটিল এবং মহাকালের রথ পুনর্ব্বার সচল হইল।

কবির দীক্ষা

ইহার আঙ্গিকের দিকটা নাটকের মত হইলেও ইহা ঠিক নাটক নহে। কারণ ইহার ভিতর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নাই, চরিত্রচিত্রন নাই, ভাবের খেলা নাই—আছে শুধু দুইজনের কথোপকথনের ভিতর দিয়া কিছু কাব্যময় তত্ত্বের নির্দ্দেশ।

কবি লক্ষ্মীছাড়া—মানুষকে সে রসাতলে দিতে উন্মুখ। ইহার কারণ এই যে, যে দেবতা তলিয়ে আছেন অতলে কবি তারই সাধক। দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের সকল কিছুর মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া ঐ সকলের রহস্যময় চরম-রূপের আবিষ্কার করাই কবির ব্রত। কবির দীক্ষায় না আছে অর্থের আশা, না আছে পরমার্থের আকাঙ্ক্ষা। সর্ব্বনাশ কথাটি কবির মনে গভীর ছাপ রাখিয়াছে—কারণ কবি জানেন যে সর্ব্বনাশ হইতেই সর্ব্বলাভ।

কবি শিবমন্ত্রের উপাসক এবং শিক্ষক। শিব-মন্ত্র ত্যাগের মন্ত্র—কারণ শিব নিজেও ভিক্ষুক। এই ত্যাগ নেতিবাদকে সমর্থন করেনা বা শূন্যতার উপাসনায় মোহমুগ্ধ নয়। শূন্য ঘড়াটাকে উপুড় করার ভিতর ত্যাগের মহিমা নাই। কবির মত হইল—

ত্যাগের রূপ দেখ ঐ ঝরণায়, নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান। নিজেকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হোলে ত্যাগী, তবে সব আগে শিব ত্যাগ করুন অন্নপূর্ণাকে। দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ব, মহৎ যিনি ঐশ্বর্য্যে। মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়, আমাদের দানকে করতে চান সার্থক। অসীম তাঁর আকাঙ্ক্ষা। এই জন্যই আমাদেরও হতে হয় বিরাট নানাদিকে ও নানাভাবে, যাতে করে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি ভরা যায়. তিনি যদি না যাচ্ঞা করতেন তাহলে আমরাও হতে পারতাম না দাতার মত দাতা। বিরাট চাওয়ার থেকেই বিরাট ভাবে নিজেদের গড়ে তোলার ইচ্ছা দেখা দেয়। "কিছুই তিনি চাননি কুকুর বেড়ালের কাছে। অন্ন চাই বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে। বেরোল মানুষ লাঙল কাঁধে। যে মাটি ফাঁকা ছিল প্রকাশ পেল তাতে অন্ন। বললেন চাই কাপড়। হাত পেতেই রইলেন, বেরোল ফলের থেকে তুলো, তুলোর থেকে সুতো, সুতোর থেকে কাপড়। ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অসীম, তাই

মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের। নইলে দিন কাটতো কুকুর বেড়ালের মতো। তোমরা কি বলো সব চেয়ে বড় সন্ন্যাসী ঐ কুকুর বেড়াল।.................... মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি, তবে ভিক্ষু দেবতার ব্যবসা হবে যে অচল। তাঁর ভিক্ষের ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী, যদি দান করতেন ঘটত সর্বনাশ।.........

তবে কি য়ুরোপখণ্ডকে বলবে শিবের চেলা? বলতে হয় বৈ কি। নইলে এত উন্নতি কেন। মেনেচে ওরা মহাভিক্ষুর দাবী। তাই বের করে আনচে নব নব সম্পদ ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।......

প্রাণের ধনই হলো আনন্দ, যাকে বলি রস। যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু। মানুষের যিনি শিব তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে। ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও দ্বারে দ্বারে রব উঠল তাঁর কণ্ঠে। সে মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা। নির্ঝরিণির স্রোত যখন হয় অলস তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান। দুর্ব্বল আত্মার তামসিক দানে দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।”

দারিদ্রের নিজস্ব কোন সৌন্দর্য্য নাই। ত্যাগের মধ্য দিয়াই ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্যকে অলঙ্কৃত করিয়া তোলে। ত্যাগেই অর্জ্জনের সার্থকতা। নিস্পৃহভাবে চিত্তসমৃদ্ধি বিত্তবৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু ভিক্ষা বন্ধ করে জমানোর দিকে মন দিলেই অশিবের আবির্ভাব হইবে। সুতরাং অর্জ্জন এবং দান একই সঙ্গে পাশাপাশি চলিতে থাকিবে। অভাব জনিত দারিদ্র্যের ভিতর সুমহান কিছু নাই একথা ভুলিলে চলিবে না।

চণ্ডালিকা

এই নাটিকাটি ১৩৪০ সালের ভাদ্রমাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া চণ্ডালিকা রচিত।

শ্রাবস্তীতে প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে বাস করিতেছেন। বুদ্ধশিষ্য আনন্দ একদিন কোনো গৃহস্থের আবাসে আহার শেষ করিয়া বিহারে ফিরিবার কালে অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ করিলেন। প্রকৃতি নাম্নী এক চণ্ডালের কন্যা কুয়া হইতে জল তুলিতেছে দেখিয়া তিনি তাহার কাছে জল চাহিলেন এবং পান করিলেন। আনন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতি তাঁহাকে পাইবার অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া নিজের মায়ের সাহায্য চাহিল। তাহার মা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং যাদুশক্তির প্রভাবে আনন্দকে রাত্রে তাহাদের গৃহে উপস্থিত করিল। কিন্তু আনন্দের মনে তীব্র পরিতাপ উপস্থিত হওয়াতে তিনি ভগবানের কাছে প্রাণের বেদনা জানাইয়া প্রার্থনা সুরু করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ ধ্যানযোগে শিষ্যের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। সেই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা পরাভূত হইল এবং আনন্দ মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাটিতে সাঙ্কেতিকতাই প্রাধান্য পাইয়াছে। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার সুরু। সকল মানুষই সমান—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে কারণ এই অস্বাভাবিক প্রথার কবলে পড়িয়া মানুষ কখনও প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার যোগ্য হইয়া উঠিবে না। তবে তত্ত্বের দিকটাতে কবি ততো জোর দেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ আনন্দের পরাজয়ের দিকটা দেখাইয়াছেন। তাহার উদ্ধারের দিকটা স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই।

আনন্দের পরাজয়ের কাহিনী ছায়াচিত্ররূপে ভাসিয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির মায়াবীনি জননীর প্রদত্ত যাদু আয়নায়। এই আয়নাটি একটি চমৎকার সাঙ্কেতিক নিদর্শন।

ম্যাজিক ও সাঙ্কেতিকতার মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। এবিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন W. B. Yeats তাঁহার Ideas of Good and Evil' পুস্তকে।

তাসের দেশ (১৩৪০)

কবির ছোটগল্প 'একটি আষাঢ়ে গল্পের' পরিবর্ত্তিত নাট্যরূপ। পুরাতন নবরূপ এবং নবশোভায় মণ্ডিত হইয়া রঙে রসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

রাজপুত্র সকল বাধা বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তির আনন্দে নূতনের সন্ধানে বাহির হইয়া যাইতে ব্যগ্র। লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া তিনি অলক্ষ্মীর আশ্রয়ের অভিলাষী,—কারণ লক্ষ্মীই করে ভীরু আর লক্ষ্মীছাড়ারই কখনও সাহসের অভাব হয় না। যার বিপদ নাই তার ভরসা করিবারও কিছু নাই। মায়ের অনুমতি লইয়া সদাগর পুত্রের সহিত বাহির হইলেন রাজপুত্র—বুড়া দৈত্যের দুর্গ হইতে নবীনাকে উদ্ধার করিতে হইবে খোঁজ করিয়া। যাত্রাপথে তরী ভগ্ন হইল এবং দুইজনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাসের দেশে। "এখানকার মানুষগুলো বেঁচেও নেই মরেও নেই। ওরা কী একরকম চৌকো চৌকো চালে নড়ছে চড়ছে, তাকে ঘুমও বলে না, জাগাও বলে না—কাব্যের কথা থেকে যেন তার ছন্দটা বেরিয়ে এসেছে, অর্থের বালাই নেই, যেমন তেমন করে চল্‌ছে।

সবাই এরা কেমন চ্যাপটা। পেটে পিঠে এক। চলে, একটুও এগোয় না। বিধাতা এদের ভিতরটাতে হাওয়া ভরে দিতে ভুলে গেছেন। এরা হাস্তে জানে না এবং কোনো কিছুর অর্থ খোঁজে না। এরা সবাই নিয়মে বাঁধা—নিয়মের বাইরের বন্ধনের দিকটাই এদের কাছে সব। নিয়মের উদ্দেশ্যের দিকটাকে বোঝবার মত ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি বা সজীবতা এদের মধ্যে নেই—এরা যন্ত্রের মতই প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন এবং নির্জীব। এদের চালটাই আছে, চলনটা নেই—কারণ চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক। এদের গুরুমশাই এদের বুঝিয়েছেন, রাস্তায় ঘাটে খানা আছে, ডোবা আছে, কাঁটা আছে, খোঁচা আছে, চলন জিনিষটার আপদ বিস্তর। এরা চতুর্বর্ণে বিভক্ত, এখানে পদমর্য্যাদা ইত্যাদি সব কিছু ধরাবাঁধা, সবকিছু নিয়ম-শাসিত। কে যে কবে এই সব নিয়ম কানুন করে দিয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এতাবৎ এসব নিয়ম ভাঙতে কেউ কখনও সাহস করে নি। এখানে গায়ে ফোঁটা কেটে সবার মূল্য ঠিক করা হয়েছে। দুরির থেকে তিরি বড়, তিরির থেকে চৌকো এবং এমনি ভাবে দহলা অবধি। এর উপরে গোলাম, বিবি সাহেব। সবচেয়ে বড় টেক্কা, যদিও তার ফোঁটা মাত্র একটি। এখানকার সবাই সনাতনপন্থী, নিয়মের ঔচিত্য নিয়ে এরা কখনও বিচার করে দেখবার কথা ভাবতেও পারেনা।

তাসের দেশে এসে সমস্ত কিছু ওলোট পালট করে দিলে বিদেশী রাজপুত্র এবং সদাগর পুত্র। এরা হাসে, গান গায় এবং ক্রমাগত নিয়মভঙ্গ করে। এখানকার রাজাকে এরা ভেট দিতে চাইলে "উৎপাত"। সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুললে, বাতাসকে করতে চাইলে হাল্‌কা। তাসের দেশে এরা একেবারে বিপ্লব উপস্থিত করলে, জাগিয়ে তুললে তাসেদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-বোধ, স্বাধীন ইচ্ছা, মুক্তির

জন্য ব্যকুলতা। অবশেষে সুরু হোল আইন-অমান্য আন্দোলন। কেউ গান জুড়ে দিলে, কেউ চুল বাঁধতে লাগলো, কেউ সুরু করলে ফুল তুলতে। কেউ আরম্ভ করলে প্রেম করতে, কেউ বল্‌লে—ভাঙ্গতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, নির্জীবের গণ্ডী—ঠেলে ফেলতে হবে এইসব নিরর্থকের আবর্জনা। সকলে দীক্ষা নিলে বিদেশীদের কাছ থেকে ইচ্ছা-মন্ত্রের—অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করবার ক্ষমতা অর্জনের মন্ত্র। এমনিভাবে বিদেশীরা তাসের দেশে আনলে মুক্তির স্বাভাবিকতা, অশান্ত গতিবেগ, নির্জীব নিয়মানুবর্ত্তিতার থেকে পরিত্রান।

বাইরে দেওয়া রয়েছে একটা ব্যঙ্গ কৌতুকের আবরণ,—ভেতরে রয়েছে তত্ত্ব। শুষ্ক নিয়মানুবর্ত্তিতা সর্বনাশেরই পথে নিয়ে যায় এবং মানুষকে মৃতকল্প করে ছাড়ে। এ যেন আমাদেরই সনাতন পন্থী নির্জীব অলস বিশেষত্বহীন পরিবর্ত্তন পরাঙ্মুখ ভারতবর্ষকেই কবি তাসের দেশের ভিতর দিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। ইহা রূপক নাট্য। যে তত্ত্বকে বলা হয়েছে তাকে অন্যভাবেও বলা যেতো। বাস্তবিক পক্ষে এই তত্ত্বই বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে "ফাল্গুনী", "অচলায়তন" প্রভৃতি নাটকে এবং অন্যান্য নানা কবিতায়। তাসের দেশের গানগুলি কিন্তু বেশীর ভাগই সঙ্কেতধর্মী। এগুলির মধ্যে একটা অসীমের জন্য ব্যাকুলতার ভাব ফুটে উঠেছে, একটা অতীন্দ্রিয় ভাব সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান।



গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক :

অযাত্রা পথে যাত্রী, যাহারা চলে (নাটক

ভুখা হুঁ (উপন্যাস)

দুর্গম হয় পন্থা (নাটক)

রবীন্দ্রনাথ—প্রথম পর্ব

কল্পনা (রবীন্দ্রনাথ)

—প্রাপ্তিস্থান—

এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।